করেছে। এ ব্যক্তি নিঃসন্দেহে চট্টোরাজ, কারণ তারই একটি মূল্যবান জিনিস খোওয়া গেছে। লালমোহনবাবুর বাক্সে লালমোহনবাবুর নোটবই ছিল, এবং তাতে যক্ষীর মাথা, প্লেন ক্র্যাশ ইত্যাদির উল্লেখ ছিল। এই খাতা চট্টোরাজ না পড়ে পারেন না এই আন্দাজে আমি লালমোহনবাবুর হাতের লেখা নকল করে চট্টোরাজকে যে চিঠিটা লিখলাম সেটার কথা জানেন। তার আগেই আমি চট্টোরাজকে নিশ্চিন্ত করার জন্য জানিয়ে দিলাম যে মূর্তি চোর ধরা পড়েছে—'

'সেই ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি!'—আমি আর লালমোহনবাবু একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলাম।

'হ্যাঁ!'—ফেলুদা হেসে বলল।—'সেটা আমার দু নম্বর ছদ্মবেশ। তোদের কাছাকাছি থাকার দরকার হয়ে পড়েছিল, কারণ লোকটা ডেঞ্জারাস। যাই হোক—চিঠির টোপ উনি বেমালুম গিলে ফেললেন। এবং তার ফলে যে কী হল সেটা আপনারা সকলেই জানেন। এবার এইটুকুই বলতে বাকি যে, এই যে গ্যাংটা ধরা হল, এর কৃতিত্বের অংশীদার ভার্গব এজেন্সির মিস্টার মল্লিক যাতে উপযুক্ত স্বীকৃতি পান সেটা আমি নিশ্চয় দেখব, আর—মিস্টার ঘোটের যাতে পদোন্নতি হয় সেটাও একান্তভাবে কামনা করব। মিস্টার কুলকার্নির ভূমিকাও যে সামান্য নয় সেটা বলাই বাহুল্য, আর সাহসের জন্য যদি মেডাল দিতে হয় তা হলে সেটা অবশ্যই পাবেন শ্রীমান তপেশ ও শ্রীযুক্ত লালমোহন গাঙ্গুলী।'

সকলের হাততালি শেষ হলে জটায়ু একটা কিন্তু কিন্তু ভাব করে বললেন, 'আমার বোমটা তা হলে আর কোনও কাজে লাগল না বলছেন?'

ফেলুদা চোখ গোল গোল করে বলল, 'সে কী মশাই—এত যে ধোঁয়া হল সেটা এল কোত্থেকে? ওটা তো আর এমনি এমনি বোমা নয়—একেবারে তিনশো ছাপ্পান্ন মেগাটন খাস মিলিটারি স্মোক-বম্ব!'

রয়েল বেঙ্গল রহস্য

১

মুড়ো হয় বুড়ো গাছ
হাত গোন ভাত পাঁচ
দিক পাও ঠিক ঠিক জবাবে।
ফাল্গুন তাল জোড়
দুই মাঝে ভুঁই ফোড়
সন্ধানে ধন্দায় নবাবে ॥

ফেলুদা বলল, 'আমাদের এবারের জঙ্গলের ঘটনাটা যখন লিখবি তখন ওই ছ লাইনের সংকেতটা দিয়ে আরম্ভ করিস।' সংকেতের ব্যাপারটা ঘটনার একটু পরের দিকে আসছে; তাই যখন জিজ্ঞেস করলাম ওটা দিয়ে শুরু করার কারণটা কী, তখন ও প্রথমে বলল, 'ওটা একটা কায়দা। ওতে পাঠককে সুড়সুড়ি দেবে।' উত্তরটা আমার পছন্দ হল না বুঝতে পেরেই বোধহয় আবার দু মিনিট পরে বলল, 'ওটা শুরুতে দিলে গল্পটা যারা পড়বে তারা প্রথম থেকে মাথা খাটাতে পারবে।'

আমি ফেলুদার কথা মতোই সংকেতটা গোড়ায় দিচ্ছি বটে, কিন্তু এটাও বলে দিচ্ছি যে মাথা খাটিয়ে বোধহয় বিশেষ লাভ হবে না, কারণ সংকেতটা সহজ নয়। ফেলুদাকে অবধি প্যাঁচে ফেলে দিয়েছিল। অবিশ্যি ও বুঝিয়ে দেবার পর ব্যাপারটা আমার কাছেও বেশ সহজ বলেই মনে হয়েছিল।

এত দিন ফেলুদার সব লোমহর্ষক অ্যাডভেঞ্চারগুলো লেখার সময় আসল লোক আর আসল জায়গার নাম ব্যবহার করে এসেছি, এবার একজন বারণ করায় সেটা আর করছি না। নকল নামের ব্যাপারে অবিশ্যি ফেলুদার সাহায্য নিতে হয়েছে। ও বলল, 'জায়গাটা যে ভুটান-সীমানার কাছে সেটা বলতে কোনও আপত্তি নেই। নামটা করে দে লক্ষ্মণবাড়ি। যে ভদ্রলোক গল্পের প্রধান চরিত্র, তার পদবিটা সিংহরায় করতে পারিস। ও নামের জমিদার এ দেশে অনেক ছিল, আর তাদের মধ্যে অনেকেরই আদি নিবাস ছিল রাজপুতানায়, অনেকেই বাংলাদেশে এসে তোডরমল্লের মোগল সৈন্যের হয়ে পাঠানদের সঙ্গে যুদ্ধ করে শেষে বাংলাদেশেই বসবাস করে একেবারে বাঙালি ব'নে গিয়েছিল।'

আমি ফেলুদার ফরমাশ মতোই ঘটনাটা লিখছি। নামগুলোই শুধু বানানো, ঘটনা সব সত্যি। যা দেখেছিলাম, যা শুনেছিলাম, তার বাইরে কিছুই লিখছি না।

ঘটনার আরম্ভ কলকাতায়। ২৭ মে, রবিবার, সকাল সাড়ে ন'টা। তাপমাত্রা একশো ডিগ্রি ফারেনহাইট। গরমের ছুটি চলেছে। ফেলুদা কলকাতাতেই ফরডাইস লেনে একটা খুনের ব্যাপারে অপরাধীকে একটা আলপিনের ক্লু-এর সাহায্যে ধরে দিয়ে বেশ নাম-টাম কিনে দু পয়সা কামিয়ে ঝাড়া হাত-পা হয়ে একটু বিশ্রাম নিচ্ছে, আমি আমার ডাকটিকিটের অ্যালবামে কয়েকটা ভুটানের স্ট্যাম্প আটকাচ্ছি, এমন সময় জটায়ুর আবির্ভাব।

রহস্য-রোমাঞ্চ উপন্যাস লেখক লালমোহন গাঙ্গুলী ওরফে জটায়ু আজকাল মাসে অন্তত দু বার করে আমাদের বাড়িতে আসেন। ওঁর বইয়ের ভীষণ কাটতি, তাই রোজগারও হয় ভালই। সেই নিয়ে ভদ্রলোকের বেশ একটু দেমাকও ছিল, কিন্তু যেদিন থেকে ফেলুদা ওঁর গল্পের নানারকম তথ্যের ভুল দেখিয়ে দিতে শুরু করেছে, সেদিন থেকে লালমোহনবাবু ওকে বিশেষ সমীহ করে চলেন, আর নতুন কিছু লিখলেই ছাপার আগে ফেলুদাকে দেখিয়ে নেন।

এবার কিন্তু হাতে কাগজের তাড়া নেই দেখে বুঝলাম, ওঁর আসার কারণটা অন্য। ভদ্রলোক ঘরে ঢুকেই সোফায় বসে পকেট থেকে একটা সবুজ তোয়ালের টুকরো বার করে ঘাম মুছে ফেলুদার দিকে না তাকিয়ে বললেন, 'জঙ্গলে যাবেন ?'

ফেলুদা তক্তাপোশের উপর কাত হয়ে শুয়ে থর হাইয়ারডালের লেখা 'আকু-আকু' বইটা পড়ছিল ; লালমোহনবাবুর কথায় কনুইয়ে ভর করে খানিকটা উঠে বসে বলল, 'আপনার জঙ্গলের ডেফিনিশনটা কী ?'

'একেবারে সেন্ট পারসেন্ট জঙ্গল। যাকে বলে ফরেস্ট।'

'পশ্চিম বাংলায় ?'

'ইয়েস স্যার।'

'সে তো এক সুন্দরবন আর তেরাই অঞ্চল ছাড়া আর কোথায়ও নেই। সব তো কেটে সাফ করে দিয়েছে।'

'মহীতোষ সিংহরায়ের নাম শুনেছেন ?'

প্রশ্ন করেই লালমোহনবাবু একটা মেজাজি হাসিতে তাঁর ঝকঝকে দাঁতের প্রায় চব্বিশটা এক সঙ্গে দেখিয়ে দিলেন। মহীতোষ সিংহরায়ের নাম আমিও শুনেছি। ফেলুদার কাছে ওঁর একটা শিকারের বই আছে— সে নাকি দারুণ বই।

'তিনি তো উড়িষ্যা না আসাম না কোথায় থাকেন না ?'

লালমোহনবাবু বুক-পকেট থেকে সড়াৎ করে একটা চিঠি বার করে বললেন, 'নো স্যার। উনি থাকেন ডুয়ার্সে— ভুটান বর্ডারের কাছে। আমার লাস্ট বইটা ওঁকে উৎসর্গ করেছিলুম। আমার সঙ্গে চিঠি লেখালেখি হয়েছে।'

'আপনি তা হলে জ্যান্ত লোককেও বই উৎসর্গ করেন ?'

এখানে লালমোহনবাবুর উৎসর্গের ব্যাপারটা একটু বলা দরকার। ভদ্রলোক বিখ্যাত লোকদের ছাড়া বই উৎসর্গ করেন না, আর তাদের মধ্যে বেশির ভাগই মারা গেছে এমন লোক। যেমন, 'মেরুমহাতঙ্ক' উৎসর্গ করেছিলেন 'রবার্ট স্কটের স্মৃতির উদ্দেশে' 'গোরিলার গোগ্রাস'— 'ডেভিড লিভিংস্টোনের স্মৃতির উদ্দেশে', 'আণবিক দানব' (যেটা ফেলুদার মতে ম্যাক্সিমাম গাঁজা) 'আইনস্টাইনের স্মৃতির উদ্দেশে'। শেষটায় 'হিমালয়ে হৃৎকম্প' উৎসর্গ করতে গিয়ে লিখে বসলেন 'শেরপা-শিরোমণি তেনজিং নোরকের স্মৃতির উদ্দেশে'। ফেলুদা তো ফায়ার। বলল, 'আপনি জলজ্যান্ত লোকটাকে মেরে ফেলে দিলেন ?' লালমোহনবাবু আমতা-আমতা করে বললেন, 'ওরা তো কনস্ট্যান্ট পাহাড়ে চড়ছে—অনেক দিন কাগজে নাম-টাম দেখিনি তাই ভাবলুম পা-টা হড়কে গিয়ে বোধহয়...।' দ্বিতীয় সংস্করণে অবিশ্যি উৎসর্গটা শুধরে দেওয়া হয়েছিল।

মহীতোষ সিংহরায় খুব বড় শিকারি তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু তা বলে কি আর এদের মতো বিখ্যাত ? তবু তাকে উৎসর্গ করা হল কেন জিজ্ঞেস করাতে লালমোহনবাবু বললেন— বইটাতে জঙ্গলের ব্যাপারের অনেক কিছুই নাকি মহীতোষবাবুর 'বাঘে-বন্দুকে' বইটা থেকে নেওয়া। তারপর মুচকি হেসে জিভ কেটে বললেন, 'মায় একটি আস্ত ঘটনা পর্যন্ত। তাই ভদ্রলোককে একটু খুশি করা দরকার ছিল।'

'সে ব্যাপারে সফল হয়েছিলেন ?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

লালমোহনবাবু খাম থেকে চিঠিটা বার করে বললেন, 'নইলে আর এভাবে ইনভাইট করে ?'

'ইনভাইট তো আপনাকে করেছে, আমাকে তো করেনি।'

লালমোহনবাবু এবার যেন একটু বিরক্ত হয়েই ভুরু-টুরু কুঁচকে বললেন, 'আরে মশাই, আপনি একজন এলেমদার লোক, আপনার একটা ইয়ে আছে, আপনাকে না ডাকলে আপনি যাবেন না— এসব কি আর আমি জানি না ? চার মাসে বইটার চারটে এডিশন হওয়াতে ওঁকে আমি সুখবরটা দিয়ে একটা চিঠি লিখি। তাতে আপনার সঙ্গে যে আমার একটু মাখামাখি আছে, তারও একটা হিন্ট দিয়েছিলুম আর কী। তাতেই এই চিঠি। আপনি পড়ে দেখুন না। আমাদের দুজনকেই যেতে বলেছে।'

মহীতোষ সিংহরায়ের চিঠির শুধু শেষের কয়েকটা লাইন তুলে দিচ্ছি—

'আপনার বন্ধু শ্রীপ্রদোষ মিত্র মহাশয়ের ধুরন্ধর গোয়েন্দা হিসাবে খ্যাতি আছে বলিয়া শুনিয়াছি। আপনি তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া আনিতে পারিলে তিনি হয়তো আমার একটা উপকার করিতে পারেন। কী স্থির করেন পত্রপাঠ জানাইবেন। ইতি।'

ফেলুদা কিছুক্ষণ চিঠিটার দিকে চেয়ে দেখে বলল, 'ভদ্রলোক কি বৃদ্ধ ?'

'বৃদ্ধের ডেফিনিশন ?' লালমোহনবাবু আধবোঁজা চোখে প্রশ্ন করলেন।

'এই ধরুন সত্তর-টত্তর।'

'নো স্যার। মহীতোষ সিংহরায়ের জন্ম নাইনটিন ফোরটিনে।'

'হাতের লেখাটা দেখে বুড়ো বলে মনে হয়েছিল।'

'সে কী মশাই, মুক্তোর মতো লেখা তো !'

'চিঠি না, সই। চিঠিটা লিখেছে সম্ভবত ওর সেক্রেটারি।'

ঠিক হল আগামী বুধবার আমরা লক্ষ্মণবাড়ি রওনা হব। নিউ জলপাইগুড়ি পর্যন্ত ট্রেন, তারপর ছেচল্লিশ মাইল যেতে হবে মোটরে। মোটরের ব্যবস্থা আমাদের করতে হবে না, মহীতোষবাবু তাঁর নিজের গাড়ি স্টেশনে পাঠিয়ে দেবেন।

জঙ্গলে যাবার কথা শুনে ফেলুদার মন যে নেচে উঠবে, আর সেই সঙ্গে আমারও, তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই, কারণ আমাদের বংশেও শিকারের একটা ইতিহাস আছে। বাবার কাছে শুনেছি বড় জ্যাঠামশাই নাকি রীতিমতো ভাল শিকারি ছিলেন। আমাদের দেশ ছিল ঢাকার বিক্রমপুর পরগনার সোনাদীঘি গ্রামে। বড় জ্যাঠামশাই ময়মনসিংহের একটা জমিদারি এস্টেটের ম্যানেজার ছিলেন। ময়মনসিংহের উত্তরে মধুপুরের জঙ্গলে উনি অনেক বাঘ হরিণ বুনো শুয়োর মেরেছেন। আমার মেজো জ্যাঠা— মানে ফেলুদার বাবা—ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে অঙ্ক আর সংস্কৃতের মাস্টার ছিলেন। মাস্টার হলে কী হবে— মুগুর ভাঁজা শরীর ছিল তাঁর। ফুটবল ক্রিকেট সাঁতার কুস্তি সব ব্যাপারেই দুর্দান্ত ছিলেন। উনি যে এত অল্প বয়সে মারা যাবেন সেটা কেউ ভাবতেই পারেনি। আর অসুখটাও নাকি আজকের দিনে কিছুই না। ফেলুদার তখন মাত্র ন বছর বয়স। মেজো জেঠিমা তার আগেই মারা গেছেন। সেই থেকে ফেলুদা আমাদের বাড়িতেই মানুষ।

আমার আরেক জ্যাঠামশাই ছিলেন, তিনি তেইশ বছর বয়সে সংসার ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়ে পশ্চিমে চলে যান ; আর ফেরেননি। তাঁরও নাকি অসাধারণ গায়ের জোর ছিল। আমার বাবা হলেন সব চেয়ে ছোট ভাই ; বড় জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে প্রায় পঁচিশ বছর বয়সের তফাত। বাবার বোধহয় খুব বেশি গায়ের জোর নেই ; তবে মনের জোর যে আছে সেটা আমি খুব ভাল করেই জানি।

ফেলুদার প্রিয় বাংলা বই হল বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক'। করবেট আর কেনেথ অ্যান্ডারসনের সব বই ও পড়েছে। নিজে শিকার করেনি কখনও, যদিও বন্দুক চালানো শিখেছে, রিভলভারে দুর্দান্ত টিপ, আর দরকার পড়লে যে বাঘও মারতে পারে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তবে ফেলুদা বলে— জানোয়ারের মতি-গতি বোঝা মানুষের চেয়ে অনেক সহজ, কারণ জানোয়ারের মন মানুষের মতো জট পাকানো নয়। মানুষের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশি সাদাসিধে, তারও মন একটা বাঘের মনের চেয়ে অনেক বেশি প্যাঁচালো। তাই একজন অপরাধীকে শায়েস্তা করাটা বাঘ মারার চেয়ে কম কৃতিত্ব নয়।

ট্রেনে যেতে যেতে ফেলুদা লালমোহনবাবুকে এই ব্যাপারটা বোঝাচ্ছিল। লালমোহনবাবুর হাতে মহীতোষ সিংহরায়ের লেখা তাঁর প্রথম শিকারের বই। বইয়ের প্রথমেই মহীতোষবাবুর ছবি, একটা মরা রয়াল বেঙ্গলের কাঁধে পা দিয়ে হাতে বন্দুক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। ছাপাটা তত ভাল নয় বলে মুখটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না, তবে চওড়া চোয়াল, চওড়া কাঁধ, আর সরু লম্বা নাকের নীচে চাড়া দেওয়া চওড়া গোঁফটা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

ছবিটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে লালমোহনবাবু বললেন, 'ভাগ্যে আপনি যাচ্ছেন আমার সঙ্গে। এরকম একটা পার্সোনালিটির সামনে আমি তো একেবারে কেঁচো মশাই।'

লালমোহনবাবুর হাইট পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি। প্রথমবার দেখে মনে হবে বাংলা ফিল্মে কিংবা থিয়েটারে হয়তো কমিক অভিনয়-টভিনয় করেন। কাজেই উনি অনেকের সামনেই কেঁচো। ফেলুদার সামনে তো বটেই।

ফেলুদা বলল, 'সরকার আইন করে শিকার বন্ধ করে দেবার ফলেই হয়তো ভদ্রলোক লেখার দিকে ঝুঁকেছেন।'

'আশ্চর্য বলতে হবে', লালমোহনবাবু বললেন, 'পঞ্চাশ বছর বয়সে প্রথম বই লিখলেন, কিন্তু পড়লেই মনে হয় একেবারে পাকা লিখিয়ে।'

'শিকারিদের মধ্যে এ জিনিসটা আগেও দেখা গেছে। করবেটের ভাষাও আশ্চর্য সুন্দর। হয়তো এটা জংলি আবহাওয়ার গুণ। পৌরাণিক যুগে যে সব মুনি-ঋষিরা বেদ-উপনিষদ লিখেছেন, তাঁরাও জঙ্গলেই থাকেন।'

শেয়ালদা ছাড়ার কিছুক্ষণ পর থেকেই লক্ষ করছিলাম, মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। মাঝ রাত্তিরে যখন নিউ ফারাক্কা স্টেশনে গাড়ি থামল, তখন ঘুম ভেঙে গিয়ে দেখি বাইরে তেড়ে বৃষ্টি হচ্ছে, আর তার সঙ্গে ঘন ঘন মেঘের গর্জন। সকালে নিউ জলপাইগুড়িতে পৌঁছে বুঝলাম এ দিকটায় মেঘলা হলেও, গত ক' দিনের মধ্যে বৃষ্টি হয়নি।

যে ভদ্রলোকটি আমাদের নিতে এলেন তিনি অবিশ্যি মহীতোষবাবু নন। ত্রিশের নীচে বয়স, রোগা, ফরসা, মাথার চুল উস্‌কো-খুস্‌কো, চোখে মোটা কাচের মোটা কালো ফ্রেমের চশমা। ভদ্রলোক আমাদের দেখে যে খুব একটা বাড়াবাড়ি রকম খাতিরের ভাব করলেন তা নয়, তবে তার মানে যে তিনি খুশি হননি সেটা নাও হতে পারে। মানুষের বাইরের ব্যবহার থেকে ফস করে তার মনের আসল ভাব সম্বন্ধে একটা ধারণা করে নেওয়াটা যে কত ভুল, সেটা ফেলুদা বার বার বলে। ভদ্রলোক নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন তিনি মহীতোষবাবুর সেক্রেটারি। নাম তড়িৎ সেনগুপ্ত। আমাদের মধ্যে কোনজন প্রদোষ মিত্তির আর কোনজন লালমোহন গাঙ্গুলী সেটা ভদ্রলোক দিব্যি আন্দাজে ধরে ফেললেন।

স্টেশনের বাইরে মহীতোষবাবুর জিপ অপেক্ষা করছিল। আমরা দশ মিনিটের মধ্যে স্টেশনেই চা আর ডিম-টোস্ট খেয়ে নিয়ে জিপে গিয়ে উঠলাম। আমাদের তিনজনের দুটো সুটকেস, আর ফেলুদার একটা কাঁধে-ঝোলানো ব্যাগ ছাড়া মাল বলতে আর কিছুই নেই, কাজেই জিপে জায়গার অভাব হল না। গাড়ি ছাড়ার মুখে তড়িৎবাবু বললেন, 'মহীতোষবাবু নিজে আসতে পারলেন না বলে দুঃখিত। ওঁর দাদার শরীরটা ভাল নেই ; ডাক্তার এসেছিল, তাই ওঁকে থাকতে হল।'

মহীতোষবাবুর যে দাদা আছে সেটাই জানতাম না। ফেলুদা বলল, 'বেশি অসুখ কি ?' আমি বুঝতে পারছিলাম অসুখের বাড়িতে অতিথি হয়ে গিয়ে হাজির হতে ফেলুদার একটা কিন্তু কিন্তু ভাব হচ্ছিল।

তড়িৎবাবু বললেন, 'না। দেবতোষবাবুর অসুখ অনেক দিনের। মাথার ব্যারাম। এমনিতে বিশেষ ঝঞ্ঝাট নেই। উন্মাদ নন মোটেই। দু মাসে তিন মাসে এক-আধবার মাথাটা একটু গরম হয়, তখন ডাক্তার এসে ওষুধের বন্দোবস্ত করে দেন।'

'বয়স কী রকম ?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

'চৌষট্টি। মহীতোষবাবুর চেয়ে পাঁচ বছরের বড়। পণ্ডিত লোক ছিলেন। ইতিহাস নিয়ে অনেক পড়াশুনা করেছেন।'

গাড়ি থেকে উত্তর দিকে হিমালয় দেখা যাচ্ছে। ওই দিকেই দার্জিলিং। দার্জিলিং আমি তিনবার গেছি, কিন্তু এবার যেদিকে যাচ্ছি সেদিকে আগে কখনও যাইনি। আকাশে মেঘ জমে আছে, তাই গরমটা কম। মাঝে মাঝে রাস্তার ধারে চা বাগান পড়ছে। শহর ছাড়ার পর থেকেই দৃশ্য ক্রমে বদলে যাচ্ছে। এবার পুব দিকেও পাহাড় দেখা যাচ্ছে। তড়িৎবাবু বললেন, 'ওটাই ভুটান।'

তিস্তা পেরোবার কিছু পর থেকেই পথের ধারে জঙ্গল পড়তে লাগল। লালমোহনবাবু একপাল ছাগল দেখে হঠাৎ, 'হরিণ, হরিণ !' বলে চেঁচিয়ে উঠলেন। ফেলুদা বলল, 'তাও ভাল, বাঘ বলেননি।'

তড়িৎবাবুর কথায় জানলাম মহীতোষবাবুর বাড়ির পশ্চিম দিকে মাইল খানেকের মধ্যেই নাকি একটা জঙ্গল রয়েছে, তার নাম কালবুনি। সেখানে এককালে অনেক বাঘ ছিল, আর সে-সব বাঘ সিংহরায়রা শিকারও করেছেন। কিন্তু এখন বড় বাঘ বা রয়েল বেঙ্গল টাইগার আর আছে কি না সন্দেহ, যদিও মাস তিনেক আগে নাকি কালবুনিতে মানুষখেকো বাঘ আছে বলে একটা শোরগোল উঠেছিল।

'আসলে নেই ?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

তড়িৎবাবু বললেন, 'একদিন একটি আদিবাসী ছেলের মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল জঙ্গলে, তার গায়ে বাঘের আঁচড় ছিল।'

'কিন্তু মাংস খায়নি ?'

'খেয়েছিল, কিন্তু সেটা বাঘ না হয়ে হায়না-জাতীয় কোনও জানোয়ারও হতে পারে।'

'মহীতোষবাবু কী বলেন ?'

'উনি তখন ছিলেন না। হাসিমারার দিকে ওঁর চা বাগান আছে, সেখানে গিয়েছিলেন। বনবিভাগের কর্তাদের ধারণা বাঘ, কিন্তু মহীতোষবাবু বিশ্বাস করতে রাজি হননি। অবিশ্যি বনবিভাগের লোক এই তিন মাস খোঁজাখুঁজি করেও সে বাঘের কোনও সন্ধান পায়নি।'

'আর-কোনও মানুষ খাওয়ার ঘটনাও ঘটেনি ?'

'না।'

মানুষখেকোর কথাটা শুনেই গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল। অবিশ্যি এ ব্যাপারে মহীতোষবাবুর কথাটাই মানতে হবে নিশ্চয়ই। লালমোহনবাবু সব শুনে-টুনে 'হাইলি ইন্টারেস্টিং' বলে আরও বেশি ভুরু কুঁচকে জঙ্গলের দিকে দেখতে লাগলেন।

একটা ছোট নদী আর একটা বড় জঙ্গল পেরিয়ে, বাঁয়ে একটা গ্রামকে ফেলে আমাদের জিপ পিচ-বাঁধানো রাস্তা ছেড়ে একটা কাঁচা রাস্তা ধরল। তবে ঝাঁকুনি বেশিক্ষণ ভোগ করতে হল না। মিনিট পাঁচেক চলার পর গাছের উপর দিয়ে একটা পুরনো বাড়ির মাথা দেখা গেল। আরও এগোতে ক্রমে গাছপালা পেরিয়ে গেটওয়ালা প্রকাণ্ড বাড়িটার পুরোটাই দেখতে পেলাম। বাড়ির রং এককালে হয়তো সাদা ছিল, এখন সমস্ত গায়ে কালসিটে পড়ে গেছে। রং যা আছে তা শুধু জানালার কাচগুলোতে ; রামধনুর সাতটা রঙের কোনওটাই বাদ নেই।

শ্বেতপাথরের ফলকে 'সিংহরায় প্যালেস' লেখা গেটটা পেরিয়ে আমাদের জিপ বাড়ির গাড়ি-বারান্দার নীচে গিয়ে দাঁড়াল।

২

মহীতোষবাবু যে এত ফরসা সেটা ছবি দেখে বোঝা যায়নি। লম্বায় ফেলুদার কাছাকাছি, যতটা রোগা ভেবেছিলাম ততটা না, মাথার চুল ছবির চেয়ে অনেক বেশি পাকা, আর বয়সের তুলনায় বেশ ঘন। শিকারিরা জঙ্গলে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চুপ করে বসে থাকে বলে শুনেছি। ইনিও হয়তো তাই করেন, কিন্তু বাড়িতে কথা বলার সময় গলা থেকে যে গুরুগম্ভীর তেজীয়ান আওয়াজ বেরোয়, সেটা শুনলে হয়তো বাঘেরও চিন্তা হবে।

ভদ্রলোক আমাদের খাতির-টাতির করে ভিতরে নিয়ে গিয়ে একটা প্রকাণ্ড বৈঠকখানায় বসানোর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ফেলুদা ওঁর লেখার প্রশংসা করে বলল, 'আমি শুধু ঘটনার কথা বলছি না— সেগুলো তো খুবই অদ্ভুত— আমার মনে হয় সাহিত্যের দিক দিয়েও আপনার লেখার আশ্চর্য মূল্য আছে।'

বেয়ারা আমের শরবত এনে আমাদের সামনে শ্বেতপাথরের নিচু টেবিলের উপর রেখেছিল, মহীতোষবাবু 'আসুন' বলে সেগুলোর দিকে দেখিয়ে দিয়ে সোফায় হেলান দিয়ে পায়ের উপর পা তুলে বললেন, 'অথচ জানেন, আমি সবে এই বছর চারেক হল কলম ধরেছি। আসলে লেখাটা বোধহয় রক্তে ছিল। আমার বাপ-ঠাকুরদা দুজনেই সাহিত্যচর্চা করেছেন। অবিশ্যি তার আগে বিশেষ কেউ করেছেন বলে মনে হয় না। আমরা রাজপুতানার লোক, জানেন তো ? ক্ষত্রিয়। এক কালে মানুষের সঙ্গে যুদ্ধ করেছি। পরে মানুষ ছেড়ে জানোয়ার ধরেছি। এখন অবিশ্যি বন্দুক ছেড়ে একরকম বাধ্য হয়েই কলম ধরেছি।'

'উনি কি আপনার ঠাকুরদা ?'

আমাদের বাঁদিকের দেওয়ালে টাঙানো একটা অয়েল পেন্টিং-এর দিকে দেখিয়ে ফেলুদা প্রশ্নটা করল।

'হ্যাঁ, উনিই আদিত্যনারায়ণ সিংহরায়।'

একখানা চেহারা বটে। জ্বলজ্বলে চোখ, পঞ্চম জর্জের মতো দাড়ি আর গোঁফ, বাঁ হাতে বন্দুক ধরে ডান হাতটা আলতো করে একটা টেবিলের উপর রেখে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে সোজা চেয়ে আছেন আমাদের দিকে।

'ঠাকুরদার সঙ্গে বঙ্কিমের চিঠি লেখালেখি ছিল, জানেন ? ঠাকুরদা তখন কলেজে পড়েন। 'বঙ্গদর্শন' বেরোচ্ছে। বঙ্কিমচন্দ্র লিখলেন 'দেবী চৌধুরানী'। আর সেই সূত্রেই ঠাকুরদা চিঠি দিলেন বঙ্কিমকে।'

'দেবী চৌধুরানী তো এই অঞ্চলেরই গল্প— তাই না ?' ফেলুদা প্রশ্ন করল।

'তা তো বটেই', মহীতোষবাবু বেশ উৎসাহের সঙ্গে বললেন, 'এই যে তিস্তা নদী পেরিয়ে এলেন, এই তিস্তাই হল গল্পের ত্রিস্রোতা নদী— যাতে দেবীর বজরা ঘোরাফেরা করত। অবিশ্যি বৈকুণ্ঠপুরের সে জঙ্গল আর নেই ; সব চা-বাগান হয়ে গেছে। গল্পে যে রংপুর জেলার কথা বলা হয়েছে, একশো বছর আগে আমাদের এই জলপাইগুড়ি সেই রংপুরের ভেতরেই পড়ত। পরে যখন পশ্চিম ডুয়ার্স বলে নতুন জেলা তৈরি হল, তখন জলপাইগুড়ি পড়ল তার মধ্যে, আর রংপুর হয়ে গেল আলাদা।'

'আপনারা শিকার আরম্ভ করলেন কবে ?'

প্রশ্নটা করলেন লালমোহনবাবু। মহীতোষবাবু হেসে বললেন, 'সে এক গল্প। আমার ঠাকুরদার খুব কুকুরের শখ ছিল, জানেন। ভাল কুকুরের খবর পেলেই গিয়ে কিনে আনতেন। এইভাবে জমতে জমতে পঞ্চাশটার উপর কুকুর হয়ে গিয়েছিল আমাদের বাড়িতে। দিশি বিলিতি ছোট বড় মাঝারি হিংস্র নিরীহ কোনওরকম কুকুর বাদ ছিল না। তার মধ্যে ঠাকুরদার যেটি সবচেয়ে প্রিয় ছিল সেটি একটি ভুটিয়া কুকুর। আমাদের এদিকে জল্পেশ্বরের শিবমন্দির আছে জানেন তো ? এককালে সেই মন্দিরকে ঘিরে শিবরাত্রির খুব বড় মেলা বসত। সেই মেলায় বিক্রির জন্য ভুটিয়ারা তাদের দেশ থেকে কুকুর আনত। ইয়া গাব্‌দা গাব্‌দা লোমশ কুকুর। ঠাকুরদা সেই কুকুর একটা কিনে পোষেন। সাড়ে তিন বছর বয়সে সেই কুকুর চিতাবাঘের কবলে পড়ে প্রাণ হারায়। ঠাকুরদার তখন জোয়ান বয়স। রোখ চাপল বাঘের বংশ ধ্বংস করে শোধ তুলবেন। বন্দুক এল। বন্দুক ছোঁড়া শেখা হল। ব্যস...দেড়শোর উপর শুধু বড় বাঘই মেরেছেন ঠাকুরদা তাঁর বাইশ বছরের শিকারি জীবনে। তা ছাড়া আরও অন্য কত কী যে মেরেছেন তার হিসেব নেই।'

'আর আপনি ?'

এ প্রশ্নটাও করলেন লালমোহনবাবু।

'আমি ?' মহীতোষবাবু হেসে ঘাড় কাত করে ডান দিকে চেয়ে বললেন, 'বলো না হে শশাঙ্ক।'

একটি ভদ্রলোক কখন যে ঘরে ঢুকে এক পাশে চেয়ারে এসে বসেছেন তা টেরই পাইনি।

'টাইগার ?' মৃদু হেসে প্রশ্ন করলেন নতুন ভদ্রলোকটি, 'তুমি লিখছ তোমার শিকার কাহিনী, তুমিই বলো না !'

মহীতোষবাবু এবার আমাদের দিকে ফিরে বললেন, 'থ্রি ফিগারসে পৌঁছতে পারিনি. সেটা ঠিকই, তবে তার খুব কমও নয়। বাঘ মেরেছি একাত্তরটা, আর লেপার্ড পঞ্চাশের উপর।'

মহীতোষবাবু নতুন ভদ্রলোকটির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন।

'ইনি হচ্ছেন শশাঙ্ক সান্যাল। আমার বাল্যবন্ধু। আমার কাঠের কারবারটা ইনিই দেখাশোনা করেন।'

বন্ধু হলে কী হবে, চেহারায় আর হাবভাবে আশ্চর্য বেমিল। শশাঙ্কবাবু লালমোহনবাবুর মতো বেঁটে না হলেও, পাঁচ ফুট সাত-আট ইঞ্চির বেশি নন, গায়ের রং মাঝারি, কথাবার্তা বলেন নিচু গলায়, দেখলেই মনে হয় চুপচাপ শান্ত স্বভাবের মানুষ। কোথাও নিশ্চয়ই দুজনের মধ্যে মিল আছে, যেটা এখনও টের পাওয়া যাচ্ছে না। নইলে বন্ধুত্ব হবে কী করে ?

'তড়িৎবাবুর কাছে একটা ম্যান-ইটারের কথা শুনছিলাম, সেটার আর কোনও খবর আছে কি ?' জিজ্ঞেস করলে ফেলুদা।

মহীতোষবাবু একটু নড়েচড়ে বসলেন।

'ম্যান-ইটার বললেই তো আর ম্যান-ইটার হয় না। আমি থাকলে দেখে ঠিক বুঝতে পারতাম। তবে যে জানোয়ারেই খেয়ে থাক, সে আর দ্বিতীয়বার নরমাংসের প্রতি লোভ প্রকাশ করেনি।'

ফেলুদা একটু হেসে বলল, 'যদি সত্যিই ম্যান-ইটার বেরোত, তা হলে আপনি অন্তত সাময়িকভাবে নিশ্চয়ই কলম ছেড়ে বন্দুক ধরতেন।'

'তা ধরতাম বইকী। আমারই এলাকায় যদি নরখাদক বাঘ উৎপাত আরম্ভ করে তবে তাকে শায়েস্তা করাটা তো আমার ডিউটি !'

আমাদের শরবত খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। মহীতোষবাবু বললেন, 'আপনারা ক্লান্ত হয়ে এসেছেন, আপনাদের ঘর দেখিয়ে দিচ্ছে, আপনারা স্নান খাওয়া সেরে একটু বিশ্রাম করে নিন। বিকেলের দিকে আমার জিপে করে আপনাদের একটু ঘুরিয়ে আনবে। জঙ্গলের ভিতর দিয়ে রাস্তা আছে, হরিণ-টরিণ চোখে পড়তে পারে, এমনকী হাতিও। তড়িৎ, যাও তো, এঁদের ট্রোফি রুমটা একবার দেখিয়ে সোজা নিয়ে যাও এঁদের ঘরে।'

ট্রোফি রুম মানে বাঘ ভাল্লুক বাইসন হরিণ কুমিরের চামড়া আর মাথায় ভরা একটা বিশাল ঘর। ঘরের মেঝে আর দেওয়ালে তিল ধরার জায়গা নেই। এতগুলো জানোয়ারের জোড়া জোড়া পাথরের চোখ চারিদিক থেকে আমাদের দিকে চেয়ে আছে দেখলেই গা-টা ছমছম করে। শুধু জানোয়ার নয় ; যেসব অস্ত্র দিয়ে এই জানোয়ার মারা হয়েছে সেগুলোও ঘরের এক পাশে একটা খাঁজকাটা র‍্যাকের উপর রাখা রয়েছে। দোনলা একনলা পাখি-মারা বাঘ-মারা হাতি-মারা কতরকম যে বন্দুক তার ঠিক নেই।

এই সব দেখতে দেখতে ফেলুদা তড়িৎবাবুকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনিও শিকার করেছেন নাকি ?'

তড়িৎবাবু একটু হেসে মাথা নেড়ে বললেন, 'একেবারেই না। আপনি গোয়েন্দা, আমার চেহারা দেখে বুঝতে পারছেন না ?'

ফেলুদা বলল, 'শিকারি হলেই যে ষণ্ডা লোক হতে হবে এমন তো কোনও কথা নেই। আসলে তা নার্ভের ব্যাপার। আপনাকে দেখে ও জিনিসটার অভাব আছে বলে মনে করার তো কোনও কারণ দেখছি না।'

'তা হয়তো নেই, তবে শিকারে প্রবৃত্তি নেই। আমি কলকাতার সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। শিকার-টিকারের কথা কোনওদিন ভাবতেই পারিনি।'

ট্রোফি রুম থেকে বেরিয়ে বাইরের বারান্দা দিয়ে দোতলার সিঁড়ির দিকে যেতে যেতে ফেলুদা বলল, 'শহরের ছেলে জঙ্গলের দেশে এলেন যে বড় ?'

তড়িৎবাবু বললেন, 'পেটের দায়ে। বি এ পাস করে বসেছিলাম। কাগজে সেক্রেটারির জন্য বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন মহীতোষবাবু। অ্যাপ্লাই করি, ইন্টারভিউয়ে ডাক পড়ে, আসি, চাকরিটা হয়ে যায়।'

'কদ্দিন আছেন ?'

'পাঁচ বছর।'

'শিকার না করলেও জঙ্গলে ঘোরাঘুরি করেন বোধহয় ?'

'মানে ?' তড়িৎবাবু একটু অবাক হয়েই ফেলুদার দিকে চাইলেন।

'আপনার ডান হাতে তিনটে আঁচড়ের দাগ দেখছি। মনে হল কাঁটাগাছ থেকে হতে পারে।'

তড়িৎবাবুর গম্ভীর মুখে হাসি দেখা দিল। বললেন, 'আপনার দৃষ্টিশক্তির পরিচয় পাওয়া গেল। কালই লেগেছে আঁচড়। জঙ্গলে ঘোরা একটা নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

'হাতিয়ার ছাড়াই ?' অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে ফেলুদা প্রশ্ন করল।

তড়িৎবাবু শান্তভাবে জবাব দিলেন, 'ভয়ের তো কিছু নেই। এক সাপ আর পাগলা হাতির জন্য দৃষ্টিটা একটু সজাগ রেখে চললে জঙ্গলে কোনও ভয় নেই।'

'কিন্তু ম্যান-ইটার ?' চাপা গলায় প্রশ্ন করলেন লালমোহনবাবু।

'সেটার অস্তিত্ব প্রমাণ হলে জঙ্গলে যাওয়া ছাড়তে হবে বইকী।'

সিঁড়ি দিয়ে উঠে বাঁদিকে একটা দরজা পেরোতেই একটা প্রকাণ্ড লম্বা বারান্দায় এসে পড়লাম। বাঁ দিকে রেলিং, ডানদিকে সারি সারি ঘর। প্রথম ঘরটাই নাকি মহীতোষবাবুর কাজের ঘর, তড়িৎবাবুকেও দিনের বেলা এখানেই বসতে হয়। কিছু দূর গিয়ে বারান্দাটা বাঁ দিকে ঘুরে গেছে। এটা হল পশ্চিমদিক। এটারও ডান দিকে ঘরের সারি, আর তারই মধ্যে একটা ঘর হল আমাদের ঘর। ফেলুদা বলল, 'এত ঘরে কারা থাকে মশাই ?'

তড়িৎবাবু বললেন, 'বেশির ভাগই ব্যবহার হয় না, বন্ধ থাকে। পুবের বারান্দায় একটা ঘরে মহীতোষবাবু থাকেন, আর একটায় ওঁর দাদা দেবতোষবাবু। শশাঙ্কবাবুর ঘর দক্ষিণে। আমারও তাই। আরও দুটো ঘর মহীতোষবাবুর দুই ছেলের জন্য রয়েছে। দুজনেই কলকাতায় চাকরি করে, মাঝে-মধ্যে আসে।'

এবার চোখে পড়ল আমাদের উলটোদিকে পুবের বারান্দায় বেগুনি ড্রেসিং গাউন পরা একজন লোক রেলিং-এর পাশে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে আমাদের দিকে দেখছে। ফেলুদা বলল, 'উনিই কি মহীতোষবাবুর দাদা ?'

তড়িৎবাবু কিছু বলার আগেই গুরুগম্ভীর গলায় প্রশ্ন শোনা গেল— 'তোমরা রাজুকে দেখেছ, রাজু ?'

দেবতোষবাবু আমাদেরই উদ্দেশে প্রশ্নটা করেছেন। ভদ্রলোক এর মধ্যেই পুব থেকে উত্তরের বারান্দায় চলে এসেছেন, তাঁর লক্ষ্য আমাদেরই দিকে। এখন বুঝতে পারছি ভদ্রলোকের চেহারায় মহীতোষবাবুর সঙ্গে বেশ মিল আছে, বিশেষ করে চোয়ালের কাছটায়। তড়িৎবাবু আমাদের হয়ে জবাব দিয়ে দিলেন, 'না, এঁরা দেখেননি।'

'দেখেনি ? আর হোসেন ? হোসেনকে দেখেছে ?'

ভদ্রলোক ক্রমে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছেন। এবার বুঝতে পারছি ওঁর চোখ দুটো কেমন যেন ঘোলাটে। মাথার সব চুল পাকা, আর মহীতোষবাবুর মতো ঘন নয়। লম্বায় হয়তো ভাইয়ের কাছাকাছি, কিন্তু কুঁজো হয়ে পড়াতে অতটা মনে হয় না।

তড়িৎবাবু, 'না, হোসেনকেও দেখেননি' বলে আমাদের ঘরের দিকে এগিয়ে যেতে ইশারা করলেন।

'দেখেনি ?' দেবতোষবাবুর গলায় যেন একটা হতাশার সুর।

'না', তড়িৎবাবু বললেন, 'এঁরা নতুন এসেছেন, কিছু জানেন না।'

'রাজু আর হোসেন কারা মশাই ?' ঘরে ঢুকে ফেলুদা প্রশ্ন করল।

তড়িৎবাবু হেসে বললেন, 'রাজু হল কালাপাহাড়ের আরেক নাম। আর হোসেন হল হোসেন খাঁ। গৌড়ের সুলতান ছিল। দুজনেই বাংলাদেশের অনেক হিন্দু মন্দির ধ্বংস করেছে। জল্পেশ্বরের মন্দিরের মাথা হোসেন খাঁ-ই ভাঙে।'

'আপনি কি ইতিহাসের ছাত্র ছিলেন ?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

'না। সাহিত্য। মহীতোষবাবু জলপাইগুড়ির ইতিহাস লিখছেন, তাই সেক্রেটারি হিসেবে আমাকেও কিছুটা জেনে ফেলতে হচ্ছে।'

তড়িৎবাবু চলে যাবার পর আমরা তিনজন প্রথম হাঁপ ছাড়ার সুযোগ পেলাম। ঘরটি দিব্যি ভাল। এ ঘরেও দুটো দরজার উপর দুটো হরিণের মাথা রয়েছে। অন্য ঘরে জায়গা

হয়নি বলেই বোধহয় মেঝেতেও একটা মাথা সমেত চিতাবাঘের ছাল দুটো খাটের মাঝখানে হাত-পা ছড়িয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। দুটো খাট আর একটা খাটিয়া গোছের জিনিস, সেটা বোধহয় আগে ছিল না, আমরা তিনজন লোক বলে এনে রাখা হয়েছে। ফেলুদা খাটিয়াটা দেখে বলল, 'দেখে মনে হয় এটাকে শিকারের মাচা হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে, দড়ি বাঁধার দাগ রয়েছে এখনও। তোপ্‌সে, তুই ওটাতে শুবি।'

তিনটে খাটের উপরে মশারি খাটানো রয়েছে, আর রয়েছে প্রায় আট ইঞ্চি পুরু গদি, দুটো করে নকশা করা ওয়াড় লাগানো বালিশ, আর একটা করে পাশ বালিশ। লালমোহনবাবু সব দেখেটেখে বললেন, 'তিনটে দিন দিব্যি আরামে কাটবে বলে মনে হচ্ছে মশাই। তবে আশা করি, দাদাটি আর রাজু-টাজুর খবর নিতে বেশি আসবেন না এদিকটায়। ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং, পাগলের সান্নিধ্যটা আমার কাছে রীতিমতো অস্বস্তিকর।'

এ কথাটা আমারও যে মনে হয়নি তা নয়। তবে ফেলুদা ও নিয়ে খুব বেশি চিন্তিত বলে মনে হল না। বাক্স খুলে জিনিস বার করতে করতে একবার খালি ভুরু কুঁচকে বলল, 'মহীতোষবাবু আমার কাছে কী ধরনের উপকার আশা করছেন সেটা এখনও বোঝা গেল না।'

৩

তড়িৎবাবু কাজে ব্যস্ত ছিলেন বলে বিকেলে আর আমাদের সঙ্গে বেরোতে পারলেন না। তার বদলে এলেন মহীতোষবাবুর বন্ধু শশাঙ্ক সান্যাল। ইনিও দেখলাম এদিকে এত দিন থেকে জঙ্গল আর জানোয়ার সম্বন্ধে অনেক কিছু জেনে ফেলেছেন। সাড়ে চারটেতেই প্রায় অন্ধকার হয়ে-যাওয়া জঙ্গলের রাস্তা দিয়ে জিপে করে যেতে যেতে কত রকম গাছপালা আর কত রকম পাখির ডাক যে আমাদের চিনিয়ে দিলেন! ত্রিশ বছর আগে এ জঙ্গলে বাঘের সংখ্যা কত বেশি ছিল তাও বললেন। ত্রিশ বছর ধরেই আছেন ভদ্রলোক লক্ষ্মণবাড়িতে। আসলে কলকাতার লোক, ইস্কুল আর কলেজে মহীতোষবাবুর সঙ্গে এক ক্লাসে পড়েছেন।

রোদ যখন প্রায় পড়ে এসেছে তখন একটা সরু নদীর ধারে এসে আমাদের গাড়িটা থামল। শশাঙ্কবাবু বললেন, 'একবার নামবেন নাকি? চলন্ত গাড়ির ভিতর থেকে জঙ্গলের পরিবেশটা ঠিক ধরতে পারবেন না।'

জিপ থেকে নেমেই প্রথম বুঝতে পারলাম জঙ্গলটা কত গভীর আর নিস্তব্ধ। বাসায় ফিরে যাওয়া পাখির ডাক আর নদীর ফুরিয়ে আসা জলের কুলকুল শব্দ ছাড়া কোনও শব্দ নেই। সঙ্গে বন্দুক না থাকলে ভয়ই করত। বন্দুক রয়েছে যার হাতে সে নাকি এখানকার একজন নামকরা পেশাদারি শিকারি। নাম মাধবলাল। আগে যখন বিদেশ থেকে শিকারিরা এখানে আসত তখন মাধবলালই নাকি তাদের গাইডের কাজ করত। কোন রাস্তায় বাঘ চলাফেরা করে, কোন গাছে মাচা বাঁধা উচিত, কোন জন্তুর ডাকের কী মানে, এ সব নাকি মাধবলালই বলে দিত। বছর পঞ্চাশ বয়স, পেটানো শরীর, তাতে চর্বির লেশমাত্র নেই।

আমরা জিপ থেকে নেমে একটু এগিয়ে গিয়ে নদীর ধারে বালি আর নুড়ি-পাথরের উপর গিয়ে দাঁড়ালাম। এ কথা সে কথার পর ফেলুদা শশাঙ্কবাবুকে জিজ্ঞেস করল, 'দেবতোষবাবু পাগল হলেন কী করে?'

শশাঙ্কবাবু বললেন, 'এদের বংশে ইনিই প্রথম পাগল নন। মহীতোষের ঠাকুরদাদারও শেষের দিকে মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল।'

'তাই বুঝি? তা হলে শিকারের ব্যাপারটা...?'

'সব বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। হাতের কাছ থেকে বন্দুক-টন্দুক সব সরিয়ে ফেলা হয়েছিল। একদিন হঠাৎ বৈঠকখানার দেওয়াল থেকে একটা পুরনো তলোয়ার খুলে নিয়ে সেটাই হাতে করে জঙ্গলে চলে গেলেন বাঘ মারতে। ইস্কুলে থাকতে ইতিহাসের বইয়ে শের শাহ-র কথা পড়েছেন তো ?— "ইনি উত্তরকালে তরবারির এক আঘাতে একটি বাঘের মস্তক ছেদন করিয়া 'শের' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন" —পাগল অবস্থায় আদিত্যনারায়ণের শের শাহ হবার শখ জাগে।'

'তারপর ?' লালমোহনবাবু চোখ গোল গোল করে চাপা গলায় প্রশ্নটা করলেন।

'সেই যে গেলেন, আর ফেরেননি। এক তলোয়ার ছাড়া আর প্রায় সব কিছুই বাঘের পেটে গিয়েছিল।'

ঠিক এই সময় কাছেই একটা জানোয়ারের চিৎকার শুনে লালমোহনবাবু প্রায় তিন হাত লাফিয়ে উঠলেন। শশাঙ্কবাবু হেসে বললেন, 'আপনি এত অ্যাডভেঞ্চারের বই লেখেন, আর শেয়ালের ডাক শুনেই এই অবস্থা ?'

'না, মানে লেখক বলেই কল্পনাশক্তিটা একটু বেশি কি না। আপনি বাঘের কথা বললেন, আর আমিও দেখলুম হলদে মতো কী জানি একটা ওই ঝোপটার পিছন দিয়ে চলে গেল।'

'এখনও যায়নি, তবে কিছুক্ষণের মধ্যে যেতে পারে।'

কথাটা খুব নিচু গলায় বললেন শশাঙ্কবাবু।

'ওইটাই কি বার্কিং ডিয়ারের ডাক ?' ফেলুদাও ফিসফিস জিজ্ঞেস করল।

একটা জন্তু ডেকে উঠেছে কয়েকবার। অনেকটা কুকুরের মতো ডাক। বাঘ কাছাকাছি এলেই বার্কিং ডিয়ার বা কাকর হরিণ ডেকে ওঠে এটা আমি ফেলুদার কাছে শুনেছি। শশাঙ্কবাবু মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলে আমাদের জিপে গিয়ে বসতে ইশারা করলেন। আমরা প্রায় নিঃশব্দে গিয়ে যে যার জায়গায় বসে পড়লাম। অন্ধকার আরও বেড়েছে। হরিণটা আবার ডেকে উঠল। জিপের হুড ফেলে দেওয়া হয়েছিল, কাজেই আশেপাশে কোনও জানোয়ার এলে আমরা সবাই দেখতে পাব। আমার বুকের ভিতরটা ঢিপ ঢিপ করছে। মাধবলালও গাড়ির কাছে এসে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। লালমোহনবাবু একবার আমার হাতটা ধরাতে বুঝতে পারলাম ওঁর হাতের তেলো বরফের মতো ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

প্রায় ছ'টা পর্যন্ত দম বন্ধ করে অপেক্ষা করেও কোনও জানোয়ার দেখতে না পেয়ে আমরা বাড়ি চলে এলাম।

সন্ধ্যার দিকে পশ্চিমের আকাশ দেখতে দেখতে কালো মেঘে ছেয়ে গেল, আর চোখ ধাঁধানো শিকড় বার-করা বিদ্যুতে আকাশটা বার বার চিরে যেতে লাগল। আমরা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে তাই দেখছিলাম, এমন সময় দরজায় টোকা পড়ল। দরজা খোলাই ছিল, ঘুরে দেখি মহীতোষবাবু।

'কীরকম বেড়ালেন ?' ভদ্রলোক তাঁর জাঁদরেল গলায় প্রশ্ন করলেন।

'আমরা আরেকটু হলেই বাঘ দেখে ফেলেছিলাম !' ছেলেমানুষের মতো চেঁচিয়ে বলে উঠলেন লালমোহনবাবু।

'বছর দশেক আগে এলে নিশ্চয়ই দেখে ফেলতেন', বললেন মহীতোষবাবু, 'আজ যে দেখতে পেলেন না, তার জন্যে অবিশ্যি আমাদের মতো শিকারিরাই খানিকটা দায়ী। শিকারটাকে যে স্পোর্টের মধ্যে ধরা হত কি না ! আজকে নয়, আদ্যিকাল থেকে। পৌরাণিক যুগে রাজারা মৃগয়ায় যেতেন। মোগল বাদশারাও যেতেন। ইদানীংকালে আমাদের দুশো বছরের প্রভু সাহেবরাও যেতেন, আর আমরাও গেছি। এই দু হাজার বছরে তীরের ফলা আর বন্দুকের গুলিতে কত জানোয়ার মরেছে ভাবতে পারেন ? তারপর সার্কাস আর

চিড়িয়াখানার জন্য কত জন্তু-জানোয়ার ধরা হয়েছে তার কোনও হিসেব আছে কি ?'

ফেলুদা মহীতোষবাবুর দিকে চেয়ার এগিয়ে দেওয়াতে ভদ্রলোক বললেন, 'বসব না। আপনাকে একটা জিনিস দেখাতে এসেছি। চলুন, আমার ঠাকুরদার ঘরে চলুন। ঘরটা দেখেও আনন্দ পাবেন।'

মহীতোষবাবুর ঠাকুরদার ঘর উত্তরদিকের বারান্দার উত্তর-পূর্ব কোণে। ঘরের দিকে যেতে যেতে ফেলুদা বলল, 'আপনার ঠাকুরদার শেষ বয়সে পাগল হয়ে যাওয়ার গল্প শুনছিলাম শশাঙ্কবাবুর কাছে।'

মহীতোষবাবু একটু হেসে বললেন, 'পাগল হবার আগে ষাট বছর বয়স অবধি তার মতো পরিষ্কার মাথা খুব কম লোকেরই দেখেছি।'

'যে তলোয়ারটা দিয়ে বাঘ মারতে গিয়েছিলেন, সেটা এখনও আছে কি ?'

'সেটা ঠাকুরদার ঘরেই আছে। চলুন দেখাচ্ছি।'

আদিত্যনারায়ণ সিংহরায়ের ঘরের তিন দিকের দেয়ালে আলমারিতে ঠাসা বই, পুঁথিপত্র আর খবরের কাগজের ডাঁই। অন্য দিকের দেওয়ালের সামনে রয়েছে দুটো সিন্দুক আর একটা কাচের আলমারি। আলমারির মধ্যে খুঁটিনাটি কত রকম যে জিনিস রয়েছে তা একবার দেখে মনে রাখা অসম্ভব। বাঘের নখ, গণ্ডারের শিং, হাতির দাঁত আর ধাতুর তৈরি নানারকম ছোটবড় মূর্তি, পাথর-বসানো ভুটিয়া গয়নাগাটি, তাঁর প্রিয় ভুটিয়া কুকুরের গলার বকলস— তাতেও লাল নীল হলদে পাথর বসানো। এ ছাড়া আছে একটা রুপোর কলম আর দোয়াত, একটা মোগল আমলের দূরবীন, আর দুটো মড়ার মাথার খুলি। ওপরের দুটো তাকের এই জিনিসগুলোর কথা আমার মনে আছে। নীচের দুটো তাকে রয়েছে খালি অস্ত্রশস্ত্র। কারুকার্য করা তিনশো বছরের পুরনো পিস্তল, গোটা আষ্টেক ছোরা, ভোজালি আর কুকরি, আর একটা তলোয়ার। এই তলোয়ারটা নিয়েই আদিত্যনারায়ণ বাঘ মারতে গিয়েছিলেন। পাগল না হলে এমন কাজ কেউ করে না, কারণ তলোয়ারটা খুব বেশি বড় নয়। বিকানিরের কেল্লায় রাজপুত রাজাদের যে তলোয়ার দেখেছিলাম সেগুলো এর চেয়ে অনেক বেশি বড় আর ভারী।

ইতিমধ্যে মহীতোষবাবু একটা সিন্দুক খুলে তার ভিতর থেকে একটা হাতির দাঁতের কাজ করা ছোট্ট বাক্স বার করে এনেছেন। এবার সেটা থেকে একটা পুরনো ভাঁজ-করা কাগজ বার করে বললেন, 'ডিটেকটিভদের তো নানারকম ক্ষমতা থাকে শুনেছি। আপনি হেঁয়ালির সমাধান করতে পারেন কি, মিস্টার মিত্তির ?'

ফেলুদা বলল, 'এককালে ওদিকটায় ঝোঁক ছিল সেটা বলতে পারি।'

ফেলুদা একটা ইংরেজি সংকেতের সমাধান করেছিল সোনার কেল্লার ব্যাপারে। বাংলা আর ইংরেজি হেঁয়ালির অনেক বই ওর কাছে আছে, আর 'বিদগ্ধমুখমণ্ডলম' বলে একটা সংস্কৃত হেঁয়ালির বইও আছে। মহীতোষবাবু এবার হাতের কাগজটা ফেলুদাকে দিয়ে বললেন, 'আপনারা তিন দিন থাকবেন বলছিলেন। তার মধ্যে যদি এই সংকেতের সমাধান না হয়, তা হলে আরও তিনটে দিন সময় দিতে পারি। তার পরে— আর না।'

শেষের ক'টা কথা বলার সময় ভদ্রলোকের স্বরটা যে কীরকমভাবে বদলে গেল তা ঠিক লিখে বোঝাতে পারব না। কিন্তু এটা বেশ বুঝতে পারলাম যে মহীতোষবাবুর ভিতরে একটা কঠিন মানুষ রয়েছে, আর সময় সময় সেই মানুষটা বাইরে বেরিয়ে পড়ে। যেমন এখন পড়ল। গলার স্বরের সঙ্গে সঙ্গে মহীতোষবাবুর চোখের চাহনিটাও বদলে গিয়েছিল, আর সেটা স্বাভাবিক হবার আগেই ফেলুদার প্রশ্ন এল—

'আর যদি পারি ?'

ফেলুদা যে ঠিক কড়া ভাবে প্রশ্নটা করেছিল তা নয়। এমনকী করার সময় ঠোঁট আর চোখের কোণে একটা হালকা হাসির ভাবও ছিল ; কিন্তু এও বুঝতে পারলাম যে মহীতোষবাবুর ভিতরের শক্ত মানুষটাকে রুখে দাঁড়াবার মতো শক্তি ফেলুদার আছে।

মহীতোষবাবু এবার বেশ সহজভাবে হেসে বললেন, 'যদি পারেন তো আমার মারা বড় বাঘের একটা ছাল আমি আপনাকে উপহার দেব।'

আজকালকার দিনে একটা রয়েল বেঙ্গলের ছাল যে নেহাত ফেলনা জিনিস নয় সেটা আমি জানতাম।

মহীতোষবাবুর হাত থেকে কাগজটা নিয়ে তাতে মুক্তোর মতো হাতের লেখা সংকেতটা ফেলুদা একবার বিড় বিড় করে পড়ল—

মুড়ো হয় বুড়ো গাছ
হাত গোন ভাত পাঁচ

দিক পাও ঠিক ঠিক জবাবে।
ফাল্গুন তাল জোড়
দুই মাঝে ভুঁই ফোঁড়
সন্ধানে ধন্দায় নবাবে।

'আপনার ঠাকুরদা কি কোনও গুপ্তধনের সন্ধান দিয়েছেন এই সংকেতে?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

'আপনার কি তাই মনে হয়?'

'শেষের লাইনটাতে তো সেই রকমই একটা ইঙ্গিত রয়েছে বলে মনে হয়। সন্ধানে ধন্দায় নবাবে। এমন জিনিস যার সন্ধান পেলে নবাবের মনও ধাঁধিয়ে যায়। ধনদৌলতের কথাই তো মনে হয়। অবিশ্যি আপনার ঠাকুরদা সে রকম লোক ছিলেন কি না সেটাও একটা প্রশ্ন। সকলে তো আর সংকেত লিখে গুপ্তধন লুকিয়ে রাখে না।'

'ঠাকুরদার পক্ষে সব কিছুই সম্ভব ছিল। তিনি চিরকালই খামখেয়ালি মানুষ ছিলেন, রং-তামাশা করতে ভালবাসতেন, প্র্যাকটিক্যাল জোক পছন্দ করতেন। ছেলেবয়সে একবার বাড়ির গুরুজনদের উপর রাগ করে মাঝরাত্তিরে উঠে তাঁদের প্রত্যেকের চটি জুতো খড়ম নাগরা সব নিয়ে তালগাছের মাথায় ঝুলিয়ে রেখে এসেছিলেন। এটা যদি গুপ্তধনের সংকেত হয়, তা হলে সেটাও তার খামখেয়ালিপনারই একটা নমুনা বললে বোধহয় ভুল হবে না। মোটকথা আপনি— কী চাই, তড়িৎ?'

তড়িৎবাবু যে কখন দরজার মুখটাতে এসে দাঁড়িয়েছেন তা টেরই পাইনি। ভদ্রলোক শান্তভাবেই বললেন, 'চরিতাভিধানটা নিয়েছিলাম, সেটা রেখে দিতে এসেছি।'

'ঠিক আছে, রেখে যাও। আর প্রুফটা দেখা হয়ে গিয়েছে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'তা হলে কাল ওটা সঙ্গে করে নিয়ে যেয়ো। আর সেকেন্ড প্রুফেও এত ভুল থাকে কেন এই নিয়ে কড়া করে কথা শুনিয়ে দিয়ে এসো তো।'

তড়িৎবাবু হাতের বইটা আলমারির তাকে একটা ফাঁকের মধ্যে গুঁজে দিয়ে চলে গেলেন।

মহীতোষবাবু বললেন, 'তড়িৎ কাল দিন-সাতেকের জন্য কলকাতা যাচ্ছে। ওর মা-র অসুখ।'

ফেলুদা এখনও ছড়াটার দিকে দেখছিল। বলল, 'এ সংকেতের কথা আর কে জানে?'

মহীতোষবাবু ঘরের বাতি নিবিয়ে দিয়ে দরজার দিকে এগোতে এগোতে বললেন, 'এটা পাওয়া গেছে এই দিন-দশেক হল। আমাদের বংশের ইতিহাস লিখব বলে পুরনো বাক্স-প্যাঁটরা ঘেঁটে দলিলপত্তর বার করছিলাম। একটা স্টিল ট্রাঙ্কে ঠাকুরদার চিঠিপত্র ছিল। ফিতেয় বাঁধা চিঠির তাড়ার তলা থেকে এই বাক্সটা বেরোয়। আসলে কী জানেন— এটার কথা যে-কজন জানে— অর্থাৎ আমি, শশাঙ্ক আর আমার সেক্রেটারি— তাদের কারুরই ক্ষমতা নেই এর মানে উদ্ধার করার। এটার জন্যে একটা বিশেষ ক্ষমতার প্রয়োজন। ভাষার মারপ্যাঁচ জানা চাই। সেটা আপনি জানেন কি না সেটাই হচ্ছে প্রশ্ন।'

ফেলুদা কাগজটা ফেরত দিয়ে দিল।

'সে কী, আপনি কি হাল ছেড়ে দিলেন নাকি?' মহীতোষবাবু ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

ফেলুদা হেসে বলল, 'না। ওটা আমার মুখস্ত হয়ে গিয়েছে। ঘরে গিয়ে খাতায় লিখে নিচ্ছি। এটা আপনাদের মূল্যবান পারিবারিক সম্পত্তি, এটা আপনাদের কাছেই থাকুক।'

৪

'আপনি তো দিব্যি মশাই একটি বাঘছাল বাগাবেন বলে মনে হচ্ছে। আর আমি ?'

একটু যেন মনমরা হয়েই কথাটা বললেন লালমোহনবাবু। আমাদের খাওয়াদাওয়া হয়েছে প্রায় ঘণ্টাখানেক হল। তারপর নীচে বৈঠকখানায় বসে মহীতোষবাবুর কাছে নানারকম লোমহর্ষক শিকারের গল্প শুনে এই কিছুক্ষণ হল নিজেদের ঘরে এসেছি। লালমোহনবাবুর কথায় ফেলুদা বলল, 'কেন ? যে-ই সংকেতটার সমাধান করবে সে-ই বাঘছাল পাবে। অন্তত পাওয়া উচিত। কাজেই আপনিও তাল ঠুকে লেগে পড়তে পারেন। আপনি তো সাহিত্যিক মানুষ, ভাষার উপর বেশ দখল আছে।'

'আরে মশাই, ভাষার উপর দখল মানে কি আর সংকেতের উপর দখল ? মহীতোষবাবুও তো সাহিত্যিক। উনি হাল ছেড়ে দিলেন কেন ? না মশাই, ও সব মুড়ো বুড়ো গাছ মাছ, তাল ফাঁক ভুঁই ফাঁক—ওসব আমার দ্বারা হবে না। আপনার ভাগ্যেই ঝুলছে বাঘছাল। এই এইটে দেবে নাকি ?'

লালমোহনবাবু মেঝেয় রাখা বাঘছালটির দিকে আঙুল দেখালেন। ফেলুদা বলল, 'ভদ্রলোক বড় বাঘের কথা বললেন শুনলেন না ? ওসব চিতা-টিতায় আমার কোনও ইন্টারেস্ট নেই।'

ফেলুদা এর মধ্যেই ছড়াটা খাতায় লিখে নিয়েছে, আর খাটে বসে সেটার দিকে একদৃষ্টে দেখছে।'

'কিছু এগোলেন ?' লালমোহনবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

ফেলুদা খাতার পাতা থেকে চোখ না তুলেই বলল, 'গুপ্তধনের সংকেত সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।'

'কী করে বুঝলেন ? ওই মুড়ো-বুড়োর ব্যাপারটা কী ?'

'সেটা এখনও জানি না, তবে একটা গাছের কথা যেন বলা হচ্ছে তাতে তো কোনও সন্দেহ নেই। মুড়ো হয় বুড়ো গাছ। তারপর বলছে হাত গোন ভাত পাঁচ। এখানে হাতটা ইম্পর্ট্যান্ট। সাধারণত এসব সংকেত প্রথমে একটা বিশেষ জায়গার কথা বলে, তারপর সেখান থেকে কোনদিকে কতদূরে গেলে গুপ্তধন পাওয়া যাবে সেটা বলে। রবীন্দ্রনাথের 'গুপ্তধন' পড়েননি ? তেঁতুল বটের কোলে দক্ষিণে যাও চলে, ঈশান কোণে ঈশানি বলে দিলাম নিশানি ? তেমনই এখানেও হাত কথাটা পাচ্ছি, দিক কথাটা পাচ্ছি। এই জন্যেই বলছি—'

ফেলুদার কথাটা শেষ হল না, কারণ ঘরে আরেকজন লোক ঢুকে পড়েছে।

দেবতোষ সিংহরায়।

সকালের সেই বেগুনি ড্রেসিং গাউনটা এখনও পরা, আর চোখে সেই অদ্ভুত চাহনি, যেন মনে হয় সকলকেই সন্দেহ করছেন। দেবতোষবাবু সোজা লালমোহনবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমরা কি ভোটরাজার লোক ?'

লালমোহনবাবু ফ্যাকাশে হয়ে ঢোক গিলে বললেন, 'ভ্-ভোট মানে কি আপনি ভ্-ভোটিং—মানে, ই-ইলেকশনের— ?'

'না, উনি বোধহয় ভুটান রাজের কথা বলছেন।'

ফেলুদা কথাটা বলায় দেবতোষবাবুর দৃষ্টি ফেলুদার দিকে ঘুরে গেল, আর তার ফলে লালমোহনবাবু একটা বিশ্রী অবস্থা থেকে উদ্ধার পেয়ে গেলেন।

'শুনেছিলাম ভোটেরা নাকি আবার আসছে ?' দেবতোষবাবু প্রশ্নটা ফেলুদাকেই করলেন।

ফেলুদা খুব স্বাভাবিকভাবেই উত্তর দিল, 'সেরকম তো শুনিনি। তবে আজকাল ইচ্ছে করলে ভুটান যাওয়া যায়।'

'ও, তাই বুঝি।'

মনে হল দেবতোষবাবু এই প্রথম খবরটা শুনলেন।

'তা বেশ। উপেন্দ্রকে ভোটরাজ অনেক হেল্‌প করেছিল। ওরা ছিল বলেই নবাবের সেনা কিছু করতে পারেনি। ওরা যুদ্ধটা জানে। সবাই জানে কি?' দেবতোষবাবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। তারপর বললেন, 'হাতিয়ার কি আর সবার হাতে বাগ মানে? সবাই কি আর আদিত্যনারায়ণ হয়?'

কথাটা বলে দেবতোষবাবু দরজার দিকে ঘুরে দু পা এগিয়ে গিয়ে থেমে গেলেন। তারপর মুখ ঘুরিয়ে মেঝের বাঘটার দিকে চেয়ে একটা অদ্ভুত কথা বললেন।

'যুধিষ্ঠিরের রথের চাকা মাটি ছুঁত না। তাও শেষটায় ছুঁল।'

ভদ্রলোক চলে যাবার পর আমরা কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম। তারপর ফেলুদা বিড়বিড় করে বলল, 'খড়ম পরেছে। তাতে রবারের সাইলেন্সার লাগানো।'

এরপর রাত্তিরে পর পর অনেকগুলো ঘটনা ঘটল। সেগুলো ঠিক মতো লেখার চেষ্টা করছি। বাইরে বারান্দায় সিঁড়ির দরজার পাশে একটা গ্র্যান্ডফাদার ক্লক থাকার দরুন ঘটনার সময়গুলো আন্দাজ করতে অসুবিধা হয়নি।

প্রথমেই বলে রাখি যে গদি বালিশ তোশকের দিক থেকে শোবার ব্যবস্থা ভাল হলেও, একটা ব্যাপারে গণ্ডগোল হয়ে যাওয়াতে প্রথম রাত্তিরে ঘুমটা একদম মাটি হয়ে গিয়েছিল।

তার কারণ আমাদের তিনজনের মশারিতেই ছিল ফুটো। মশারি ফেলার দশ মিনিটের মধ্যে ভেতরে মশা ঢুকে কামড় আর বিনবিনুনির জ্বালায় আমাদের ঘুমের বারোটা বাজিয়ে দিল। ফেলুদার সঙ্গে ওডোমস থাকে, শেষটায় তাই মেখে কিছুটা আরাম পাওয়া গেল। বাইরের ঘড়িতে তখন ঢং ঢং করে এগারোটা বেজেছে। দিনের বেলা মেঘলা থাকলেও এখন জানালা দিয়ে চাঁদের আলো আসছিল। সবেমাত্র চোখের পাতাটা বুজে এসেছে এমন সময় একটা চেনা গলায় ধমকের সুরে কথা এল।

'আমি শেষবারের মতো বলছি— এর ফল ভাল হবে না।'

গলাটা মহীতোষবাবুর। উত্তরে কে যে কী বলল তা বোঝা গেল না। তার পরে সব চুপচাপ। আমার বাঁদিকে লালমোহনবাবুর মশারির ভিতর থেকে নাক ডাকার শব্দ শুরু হয়েছে। আমি ডান পাশে ফেলুদার খাটের দিকে ফিরে চাপা গলায় বললাম, 'শুনলে?'

গম্ভীর ফিসফিসে গলায় উত্তর এল, 'শুনেছি। ঘুমো।'

আমি চুপ করে গেলাম।

তার কিছুক্ষণের মধ্যেই বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছি। ঘুমটা যখন ভাঙল তখনও ঘরে চাঁদের আলো রয়েছে, কিন্তু সেই সঙ্গে মেঘের গর্জনও শোনা যাচ্ছে মাঝে মাঝে। একটা লম্বা গুড়গুড়ানি থামলে পর আরেকটা শব্দ কানে এল। ঘুট ঘুট...ঘুট ঘুট...ঘুট ঘুট...। তালে তালে একটানা শব্দ নয়। মাঝে মাঝে হচ্ছে, মাঝে মাঝে থেমে যাচ্ছে, আর মাঝে মাঝে মেঘের গর্জনে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। শব্দটা হচ্ছে বেশ কাছ থেকেই। আমাদের ঘরের ভিতরেই। ফেলুদার খাটের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে কান পাততেই ওর জোরে জোরে নিশ্বাস পড়ার শব্দ পেলাম। ও ঘুমোচ্ছে।

কিন্তু লালমোহনবাবুর নাক ডাকা বন্ধ কেন? ওঁর খাটের দিকে চেয়ে ডবল মশারির ভিতর দিয়ে কিছুই দেখতে পেলাম না। কিন্তু একটা ক্ষীণ শব্দ যেন আসছে খাটের দিক থেকে। এটা আমার চেনা শব্দ। বাক্স-রহস্যের ব্যাপারে সিমলার বরফের মধ্যে একটা পিস্তলের গুলি লালমোহনবাবুর পায়ের কাছে এসে পড়ায় তার দাঁতে দাঁত লেগে ঠিক এই শব্দটাই হয়েছিল।

সেই সঙ্গে আবার সেই শব্দটা কানে এল। ঘুট ঘুট...ঘুট ঘুট...ঘুট ঘুট...

আমি ঘাড় কাত করে মেঝের দিকে চাইলাম। ফলে মশারিটা একটু নড়ে ওঠাতে বোধহয় লালমোহনবাবু বুঝলেন আমার ঘুম ভেঙে গেছে। একটা বিকট চাপা ঘড়ঘড় স্বরে তিনি বলে উঠলেন, 'ত-তপেশ—বা-বাঘ!'

বাঘ শুনেই আমার চোখ মেঝের বাঘছালটার দিকে চলে গেল, আর যেতেই যা দেখলাম তাতে আমার রক্ত জল হয়ে গেল।

জ্যোৎস্নার আলো বাঘের মাথাটার উপর পড়েছে, আর স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি মাথাটা মাঝে মাঝে এদিক-ওদিক নড়ে উঠছে, আর তার ফলেই ঘুট ঘুট শব্দ হচ্ছে।

আর থাকতে না পেরে যা থাকে কপালে ভেবে ফেলুদার নাম ধরে একটা চাপা চিৎকার দিয়ে উঠলাম। ফেলুদার ঘুম যতই গাঢ় হোক না কেন, ও সব সময় এক ডাকে উঠে পড়ে, আর ওঠামাত্র ওর মধ্যে আর ঘুমের লেশমাত্র থাকে না।

'কী ব্যাপার? চ্যাঁচাচ্ছিস কেন?'

আমারও প্রায় লালমোহনবাবুর দশা। কোনওরকমে ঢোক গিলে বলে ফেললাম, 'মেঝে...বাঘ।'

ফেলুদা মশারির ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে বাঘটার নড়ন্ত মাথাটার দিকে একদৃষ্টে খানিকক্ষণ দেখে নিল। তারপর দিব্যি নিশ্চিন্তভাবে এগিয়ে গিয়ে বাঘের থুতনিটা ধরে উপরে তুলতেই তার নীচ থেকে একটা গুবরে পোকা বেরিয়ে পড়ল। ফেলুদা অম্লানবদনে সেটাকে

দু আঙুলের চাপে তুলে নিয়ে বলল, 'গুবরের আসুরিক শক্তির কথাটা কি তোদের জানা নেই ? একটা কাঁসার জামবাটি চাপা দিয়ে রাখলে সেটাকে সুদ্ধু টেনে নিয়ে সারা বাড়ি চক্কর দিতে পারে।'

ভয়ের কারণটা এত সামান্য জানলে অবিশ্যি ঘামটাম আপনা থেকেই শুকিয়ে যায়। আমার আর লালমোহনবাবুরও তাই হল। এদিকে ফেলুদা গুবরেটাকে নিয়ে জানালার বাইরে ফেলে দিয়ে দেখি সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে। এই গভীর রাত্তিরে ফেলুদা কী দেখছে সেটা ভাবছি, এমন সময় ও ডাক দিল, 'তোপ্‌সে, দেখে যা।'

আমি আর লালমোহনবাবু ফেলুদার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম।

আগেই বলেছি পশ্চিমদিকটা বাড়ির পিছন দিক, আর এদিক দিয়েই কালবুনির জঙ্গল দেখা যায়। এই ক মিনিটের মধ্যেই কালো মেঘে চাঁদ ঢেকে ফেলেছে। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল বটে, কিন্তু তা ছাড়াও আর একটা আলো দেখে অবাক লাগল। আলোটা মনে হল জঙ্গলের ভিতর ঘোরাফেরা করছে। টর্চের আলো।

'হাইলি সাসপিশাস', ফিসফিস করে বললেন লালমোহনবাবু।

আলোটা এবার নিবে গেল।

এবার একটা চোখ ধাঁধানো বিদ্যুতের সঙ্গে সঙ্গে একটা কানফাটা বাজের আওয়াজ, আর তার পরমুহূর্তেই বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা শুরু হয়ে গেল। পশ্চিমদিক থেকেই ছাঁট, তাই দুটো জানালারই শার্সি বন্ধ করে দিতে হল। ফেলুদা বলল, 'একটা বেজে গেছে, শুয়ে পড়। কাল সকালে আবার জল্পেশ্বরের মন্দির দেখতে যাবার কথা আছে।'

আমরা তিনজনেই আবার মশারির ভিতর ঢুকলাম।

জানালায় রঙিন কাচ থাকার ফলে বিদ্যুৎ চমকালেই ঘরে রামধনুর রং খেলছিল। সেই রং দেখতে দেখতেই আবার কখন যে ঘুমিয়ে পড়লাম তা টেরই পাইনি।

৫

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙল প্রায় সাতটায়। ফেলুদা অবিশ্যি তার আগেই উঠে যোগব্যায়াম, দাড়ি কামানো-টামানো সব সেরে ফেলেছে। কথা আছে, তড়িৎবাবু আটটায় এসে আমাদের নিয়ে জল্পেশ্বরের মন্দির দেখিয়ে আনবেন। মহীতোষবাবুর তিনজন চাকরের মধ্যে যার নাম কানাই, সে আমাদের চা দিয়ে গেল সাড়ে সাতটার কিছু পরে। ফেলুদা চায়ের কাপ হাতে নিয়ে কোলের উপর রাখা খোলা খাতাটার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে প্রায় আপন মনেই বলে উঠল, 'ধন্যি আদিত্যনারায়ণ। তুখোড় বুদ্ধি বলতে হবে।'

লালমোহনবাবু চকাৎ শব্দ করে চায়ে একটু চুমুক দিয়ে বললেন, 'বাঃ, ফার্স্ট ক্লাস চা।— আরও এগোলেন বুঝি ?'

ফেলুদা সেইভাবেই বিড়বিড় করে বলল, 'হাত গোন ভাত পাঁচ। ভাত হল অন্ন আর পাঁচ হল পঞ্চ। দুটোকে উলটিয়ে নিয়ে সন্ধি করে হল পঞ্চান্ন। অর্থাৎ পঞ্চান্ন হাত। বাঃ! ...কিন্তু কীসের থেকে পঞ্চান্ন হাত ? বুড়ো গাছ কী ? তাই হবে...তাই হবে...'

ফেলুদার গলা মিলিয়ে এল। আমার মন বলছে, ও দুদিনের মধ্যেই সংকেতের সমাধান করে ফেলবে, আর বাঘছালটা পেয়ে যাবে।

বারান্দার ঘড়িতে কিছুক্ষণ আগেই আটটা বেজে গেছে, কিন্তু তড়িৎবাবু এখনও আসছেন না কেন ? ফেলুদার কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপই নেই। সে একমনে সংকেত নিয়ে ভেবে চলেছে, আর মাঝে মাঝে বিড় বিড় করে উঠছে।

'ঠিক ঠিক জবাবে...ঠিক ঠিক জবাবে... । কীসের জবাব ? প্রশ্নটা কই যে তার জবাব হবে ? দিক পাও ঠিক ঠিক জবাবে...ঠিক ঠিক জবাবে...'

এবার ফেলুদার বিড়বিড়ানি বন্ধ হবার আগেই দরজায় টোকা দিয়ে ঘরে একজন লোক ঢুকে পড়ল । তড়িৎবাবু নন । শশাঙ্কবাবু ।

'আপনারা—ইয়ে—চা খাচ্ছেন ? ও...'

ভদ্রলোকের চেহারা দেখেই মনে হল কিছু একটা হয়েছে । ফেলুদা খাতা রেখে উঠে পড়ল ।

'কী ব্যাপার বলুন তো ?'

শশাঙ্কবাবু গলা খাকরিয়ে কেমন যেন অন্যমনস্কভাবে বললেন, 'একটা দুঃসংবাদ আছে । তড়িৎ, মানে মহীতোষের সেক্রেটারি, মারা গেছে ।'

'সে কী ? কী হয়েছিল ? কাল রাত্রেও তো...'

কথাটা বলল ফেলুদা, কিন্তু আমরা তিনজনেই সমান হতভম্ব । শশাঙ্কবাবু বললেন, 'কাল রাত্রে কালবুনির দিকে গিয়েছিল— কেন জানি না— এই একটুক্ষণ আগে তার মৃতদেহ পাওয়া গেছে । এক কাঠুরে দেখতে পায়, আর দেখেই এসে খবর দেয় ।'

'কী ভাবে মারা গেলেন ?'

'কাঁধের অনেকখানি মাংস নাকি খেয়ে গেছে । বাঘ বলেই তো মনে হচ্ছে ।'

ম্যান-ইটার ! আমার হাত-পা আবার ঠাণ্ডা হয়ে আসছে । লালমোহনবাবু ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিন পা পিছিয়ে গিয়ে টেবিলে ভর করে দাঁড়ালেন । ফেলুদার মুখের ভাব অদ্ভুত রকম গম্ভীর ।

শশাঙ্কবাবু বললেন, 'আপনারা এলেন, আর তার মধ্যে এই দুর্ঘটনা । বুঝতেই পারছেন, আমাদের এখন এই নিয়ে একটু ব্যস্ত থাকতে হবে । এখনই, মানে, একবার যেতে হবে আর কী ।'

'আমরাও যেতে পারি কি ?'

শশাঙ্কবাবু প্রশ্নটা শুনে ফেলুদার দিকে একবার দেখে তারপর আমাদের দুজনের দিকে এক ঝলক দৃষ্টি দিয়ে বললেন, 'আপনি তো গোয়েন্দা মানুষ, আপনার এসব অভ্যেস আছে, কিন্তু এঁরা...'

'ওরা গাড়িতেই থাকবে ।'

ভদ্রলোক রাজি হয়ে গেলেন । বললেন, 'তা হলে আপনারা তৈরি থাকলে চলে আসুন । দুটো জিপ আছে, একটাতে না হয় আপনারা তিনজন যাবেন ।'

'বন্দুক থাকবে কি সঙ্গে ?'

প্রশ্নটা আমিও করতে পারতাম, কিন্তু করলেন লালমোহনবাবু । অন্য সময় এ ধরনের প্রশ্ন শুনলে হয়তো শশাঙ্কবাবু হেসে ফেলতেন, কিন্তু এখন গম্ভীরভাবেই বললেন, 'থাকবে । দিনের বেলা এমনিতে ভয় নেই, তবু থাকবে ।'

জিপে করে জঙ্গলের দিকে যেতে যেতে এই ভয়ঙ্কর ঘটনাটার কথা ভাবছিলাম । কালই ভদ্রলোক আমার সঙ্গে এত কথা বললেন, আর রাতারাতি তাকে বাঘে খেল ? এত রাত্তিরে কী করছিলেন উনি জঙ্গলের মধ্যে ? তা হলে কি কাল রাত্তিরে যে আলোটা দেখেছিলাম সেটা তড়িৎবাবুরই টর্চের আলো ?

আমাদের জিপের সামনে আরেকটা জিপ চলেছে । তাতে রয়েছেন মহীতোষবাবু, শশাঙ্কবাবু, এখানকার বনবিভাগের একজন কর্মচারী মিস্টার দত্ত, শিকারি মাধবলাল, আর যে

লোকটা তড়িৎবাবুর মৃতদেহ দেখতে পেয়েছিল সেই কাঠুরে। মহীতোষবাবুকে কাল রাত্রেই হই-হই করে শিকারের গল্প বলতে শুনেছিলাম, আর আজ দেখে মনে হল এক রাত্তিরে তার দশ বছর বয়স বেড়ে গেছে। সেটা শুধু সেক্রেটারির মৃত্যুর জন্য, না ম্যান-ইটার আছে এটা প্রমাণ হবার জন্য, তা অবিশ্যি বুঝতে পারলাম না।

জঙ্গলের ভিতরে খুব বেশি দূরে যেতে হল না। বড় রাস্তা থেকে ঘুরে মিনিট পাঁচেক যাবার পর আমাদের সামনের জিপটা থামল। রাস্তার দু দিকে শাল আর সেগুন গাছ, আর তা ছাড়া আমার চেনার মধ্যে শিমুল, নিম, একটা প্রকাণ্ড কাঁঠালগাছ আর কয়েকটা বাঁশঝাড়। কাল রাত্রে যে বৃষ্টি হয়েছে তার ছাপ রয়েছে চারদিকে। এখানে ওখানে ছোট ছোট গর্ত আর খানাখন্দের মধ্যে জল জমে রয়েছে।

জিপ থামার সঙ্গে সঙ্গেই ফেলুদা বলল, 'ওই দ্যাখ।'

ও যেদিকে আঙুল দেখাল সেদিকে বেশ খানিকক্ষণ চেয়ে থাকার পর দূরের একটা বাঁশঝাড়ের ধারে একটা ঝোপের পিছনে হাল্‌কা সবুজ রঙের যে জিনিসটা চোখে পড়ল সেটা আমার চেনা। ওটা তড়িৎবাবুর শার্ট। কাল রাত্রে ভদ্রলোক ওই শার্টটাই পরেছিলেন।

সামনের জিপ থেকে সবাই নেমেছে। কাঠুরে লোকটা এগিয়ে গেল। তার পিছনে চললেন মহীতোষবাবু ও বাকি তিনজন। ফেলুদাও জিপ থেকে নেমে বলল, 'তোরা গাড়িতে থাক। এ দৃশ্য তোদের ভাল লাগবে না।'

যেখানে তড়িৎবাবুর মৃতদেহ পড়ে আছে সে জায়গাটা আমাদের জিপ থেকে প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ হাত দূরে। কিন্তু জঙ্গল এত নিস্তব্ধ বলেই বোধহয় সকলের কথাবার্তা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলাম। যার মুখে যা শুনলাম তা পর পর লিখে যাচ্ছি।

বাঁশঝাড়টার ধারে পৌঁছে প্রথম কথা বললেন মহীতোষবাবু। শুধু দুটো কথা— 'মাই গড!'—আর সেই সঙ্গে তাঁর ডান হাতের তেলোটা দিয়ে কপালে একটা আঘাত করলেন।

এবার মিস্টার দত্ত মৃতদেহটার দিকে এগিয়ে গেলেন, আর তার পরেই তাঁর কথা শোনা গেল।

'এই বৃষ্টিতে বাঘের পায়ের ছাপ খোঁজার চেষ্টা বৃথা। কিন্তু বাঘ বলেই তো মনে হচ্ছে। তাই নয় কি?'

মহীতোষবাবু— 'নিঃসন্দেহে।'

মিস্টার দত্ত—'কাল বৃষ্টি থেমেছে দুটোর পর। যেভাবে রক্ত ধুয়ে গেছে তাতে মনে হয়, খাওয়ার ব্যাপারটা বৃষ্টির আগেই সেরে ফেলেছে।'

ফেলুদা— 'ম্যান-ইটার কি যেখানে মানুষ মারে, সেখানেই খাওয়ার কাজটা সারে? অনেক সময় ওরা শিকার মুখে করে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় নিয়ে যায় না?'

মহীতোষবাবু— 'তা তো বটেই। তবে আপনি যদি আশা করেন যে, মাটিতে ঘষটে টেনে আনার দাগ থাকবে, সেটার বিশেষ সম্ভাবনা নেই। এমনিতেই বৃষ্টিতে দাগ মুছে যাবে। তা ছাড়া একটা মানুষের দেহ বাঘ মুখে করে এমনভাবে নিয়ে যেতে পারে যে, সে দেহ মাটি টাচ-ই করবে না। সুতরাং তড়িৎকে কোথায় ধরেছিল বাঘে সেটা বোধহয় জানা যাবে না।'

ফেলুদা— 'তড়িৎবাবুর চশমাটা কোথায় পড়েছে সেটা জানতে পারলে হয়তো...'

এরপর কিছুক্ষণ কারুর মুখেই কোনও কথা নেই। শশাঙ্কবাবু বোধহয় বাঘের পায়ের ছাপ খোঁজার জন্য এদিক ওদিক দেখছেন। ফেলুদা এখনও মৃতদেহের কাছেই রয়েছে। মিস্টার দত্ত মাধবলালকে কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় আবার ফেলুদার গলা পাওয়া গেল।

ফেলুদা— 'বাঘ কি কেবল একটা মাত্র নখের সাহায্যে একটা গভীর আঁচড় দিতে পারে?'

মহীতোষবাবু—'হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন ?'

ফেলুদা—'আপনারা বোধহয় লক্ষ করেননি—তড়িৎবাবুর বুকের কাছে একটা গভীর ক্ষতচিহ্ন রয়েছে। শার্ট ভেদ করে একটা ধারালো জিনিস তার শরীরের মধ্যে ঢুকেছে। আপনারা এইখানে এলেই দেখতে পাবেন।'

কথাটা বলা মাত্র সকলে ব্যস্তভাবে তড়িৎবাবুর মৃতদেহের দিকে এগিয়ে গেল। তারপর মহীতোষবাবুর গলা পেলাম।

মহীতোষবাবু—'সর্বনাশ ! এ যে খুন ! এ তো বাঘের আঁচড় নয়। তড়িৎকে খুন করা হয়েছিল। তারপর তার মৃতদেহ বাঘে টেনে নিয়ে আসে। কী ভয়ঙ্কর ব্যাপার !'

ফেলুদা—'খুন বা খুনের চেষ্টা। ছুরির আঘাতেই তড়িৎবাবুর মৃত্যু হয়েছিল কি না সেটা এখনও বলা শক্ত। হয়তো তাকে জখম করে আততায়ী পালায়। জখম অবস্থাতে স্বভাবতই বাঘের কাজটা আরও সহজ হয়ে গিয়েছিল। যে অস্ত্র দিয়ে এই কুকীর্তিটা করা হয়েছে, সেটা খোঁজার চেষ্টা করা দরকার।'

মহীতোষবাবু—'শশাঙ্ক, তুমি এক্ষুনি পুলিশে খবর দাও।'

বন্দুক হাতে মাধবলালকে তড়িৎবাবুর মৃতদেহের পাশে পাহারায় রেখে আর সবাই জিপে ফিরে এল। ফেলুদাকে এত গম্ভীর অনেক দিন দেখিনি। ফেরার পথে ও একটাও কথা বলল না। আমাদেরও কথা বলার মতো মনের অবস্থা ছিল না। বনের মধ্যে একপাল হরিণকে ছুটতে দেখেও মনটা নেচে উঠল না। লালমোহনবাবু এর আগেও আমাদের সঙ্গে গায়ে কাঁটা-দেওয়া অবস্থায় পড়েছেন, কিন্তু ওকে এমন ফ্যাকাসে হয়ে যেতে দেখিনি কখনও। কোনও জায়গায় বেড়াতে এসে আচমকা রহস্যের মধ্যে জড়িয়ে পড়ার ঘটনা ফেলুদার জীবনে এর আগেও ঘটেছে, কিন্তু এভাবে নয়। এখানে তো শুধু খুন নয় বা রহস্য নয়, তার উপরে আবার মানুষখেকো !

৬

শশাঙ্কবাবু খবর দেওয়াতে কিছুক্ষণের মধ্যেই জলপাইগুড়ি থেকে পুলিশের লোক এসে তদন্ত শুরু করে দিয়েছে। এখন বিকেল পাঁচটা। আজ আকাশ পরিষ্কার। আমরা মহীতোষবাবুর নিজের বাগানের অদ্ভুত ভাল চা খেয়ে ঘরে বসে আছি। ফেলুদা ভুরু কুঁচকে পায়চারি করছে, মাঝে মাঝে আঙুল মটকাচ্ছে, আর মাঝে মাঝে একটা চারমিনার ধরিয়ে দু-চারটে টান দিয়েই টেবিলের উপর রাখা পিতলের ছাইদানিটায় ফেলে দিচ্ছে। লালমোহনবাবু ইতিমধ্যে বার তিনেক মাটিতে শোয়ানো বাঘের মাথাটা পরীক্ষা করেছেন ; বিশেষ করে দাঁতগুলো।

'ভদ্রলোকের সঙ্গে যদি আরেকটু আলাপ করার সুযোগ হত !'

ফেলুদা এ কথাটা আপন মনে আরও কয়েক বার বলেছে। সত্যি, তড়িৎবাবুকে ভাল করে চেনার আগেই তিনি খুন হয়ে গেলেন। খুনের কারণ কী হতে পারে, তড়িৎবাবুর সঙ্গে কারুর শত্রুতা ছিল কি না, এই সব না জানলে পরে ফেলুদার পক্ষে রহস্যের কিনারা করা মুশকিল হবে নিশ্চয়ই।

বারান্দার ঘড়িতে পাঁচটা বাজার কয়েক মিনিট পরেই মহীতোষবাবুর একজন চাকর— যার নাম জানি না— এসে খবর দিল, নীচের বৈঠকখানায় আমাদের ডাক পড়েছে।

আমরা তিনজনে বেশ ব্যস্তভাবেই নীচে গিয়ে হাজির হলাম। মহীতোষবাবু আর শশাঙ্কবাবু ছাড়াও আরেকটি ভদ্রলোক সোফায় বসে আছেন। পোশাক দেখে বুঝলাম ইনি পুলিশের লোক। মহীতোষবাবু পরিচয় করিয়ে দিলেন—

'ইনি ইনস্পেক্টর বিশ্বাস। আপনিই প্রথম ক্ষতচিহ্নটা দেখে খুনের কথাটা বলেছেন জেনে আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চাইলেন।'

ফেলুদা নমস্কার করে মিস্টার বিশ্বাসের উলটোদিকে সোফাটায় বসল, আমরা দুজন একটু দূরে আর একটা সোফায় বসলাম।

মিস্টার বিশ্বাসের গায়ের রং রীতিমতো কালো, মাথায় চকচকে টাক, যদিও বয়স বোধহয় চল্লিশ-টল্লিশের বেশি নয়। সরু একটা গোঁফও আছে, তার দুটো দিক আবার লম্বায় সমান নয়। ছাঁটবার সময় বোধহয় একটু অসাবধান হয়ে পড়েছিলেন। ভদ্রলোক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ফেলুদার দিকে দেখে বললেন, 'আপনি শুনলাম শখের ডিটেকটিভ।'

ফেলুদা একটু হেসে বুঝিয়ে দিল, কথাটা ঠিক।

বিশ্বাস বললেন, 'আপনাদের আর আমাদের মধ্যে তফাতটা কোথায় জানেন তো? আপনারা কোথাও গেলে পরে সেখানে খুন হয়, আর আমরা কোথাও খুন হলে পরে সেখানে যাই।' কথাটা বলে নিজের রসিকতায় নিজেই হো হো করে হেসে উঠলেন ইনস্পেক্টর বিশ্বাস।

ফেলুদা আর কথা না বাড়িয়ে একেবারে কাজের কথায় চলে গেল। বলল, 'খুনের অস্ত্রটা পাওয়া গেছে কি?'

বিশ্বাস হাসি থামিয়ে মাথা নেড়ে বললেন, 'না। তবে খোঁজা হচ্ছে। জঙ্গলের মধ্যে খানাতল্লাসির ব্যাপারটা কীরকম কঠিন সে তো বুঝতেই পারছেন। তার উপর আবার ম্যান-ইটার। পুলিশরাও তো মানুষ—মানে, ম্যান—বুঝলেন তো? হোঃ হোঃ হোঃ।'

বিশ্বাস মশাই এত হাসছেন দেখে ফেলুদাও যেন জোর করেই একটু হেসে আবার গম্ভীর হয়ে বলল, 'ছুরির আঘাতেই মরেছিলেন কি তড়িৎবাবু?'

বিশ্বাস বললেন, 'সেটা তো আর এখন বোঝবার উপায় নেই। লাশের যা অবস্থা, এমনিতেই বাঘে খেয়ে গেছে অনেকটা। তার উপর এই গরম; পোস্ট মর্টেমে কোনও ফল হবে বলে মনে হয় না। আসল কথা হচ্ছে— কোনও ব্যক্তি তড়িৎবাবুকে কোনও ধারালো অস্ত্রের সাহায্যে খুন করেছিল, বা খুন করার চেষ্টা করেছিল। তারপর বাঘে কী করেছে না করেছে সেটা আমাদের কনসার্ন না। তার জন্য যা স্টেপ নেবার সেটা নেবেন মিস্টার সিংহরায়।'

মহীতোষবাবু গম্ভীরভাবে মেঝের কার্পেটের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এর মধ্যেই আশপাশের গ্রামে প্যানিক আরম্ভ হয়ে গেছে। আমার লোকও তো জঙ্গলে কাঠ কাটার কাজ করে। আরও দু মাস কাজ রয়েছে, তারপর বর্ষা নামলে বন্ধ। অবস্থা গুরুতর সেটা বুঝতে পারছি। কিন্তু তড়িৎকে এভাবে আক্রমণ করল কে এবং কেন, সেটা না জানা অবধি আমি অন্য কিছু ভাবতেই পারছি না। অবিশ্যি আমিই তো আর একমাত্র শিকারি নই এ অঞ্চলে। বনবিভাগ থেকে শিকারির ব্যবস্থা করা কঠিন হবে না।'

মিস্টার বিশ্বাস গলা খাকরিয়ে একটু নড়ে বসে বললেন, 'আমার কাছে রহস্য একটাই— এত রাত করে জঙ্গলে গেলেন কেন আপনাদের তড়িৎবাবু। খুনের একটা খুব সহজ কারণ থাকতে পারে। তড়িৎবাবুর পকেটে কোনও মানিব্যাগ বা টাকা-পয়সা পাওয়া যায়নি। তার ঘর খুঁজে সেখানেও পাওয়া যায়নি। এ অঞ্চলে গুণ্ডা বদমাইশের তো অভাব নেই। এ অঞ্চলে কেন বলছি— সারা দেশেই নেই— হোঃ হোঃ হোঃ। তাদেরই কেউ এ কুকীর্তিটা করে থাকতে পারে। স্রেফ রাহাজানি আর কী।'

ফেলুদা একটা সিগারেট ধরিয়ে শান্তভাবে বলল, 'মাঝ রাত্তিরে জঙ্গলের মধ্যে তড়িৎবাবুর মতো একজন নিরীহ লোকের কাছ থেকে টাকা বার করে নিতে কি ছুরি মারার দরকার হয়?

মাথায় একটা লাঠির বাড়ি মেরেই কার্যসিদ্ধি হয় না কি ?'

বিশ্বাস কাষ্ঠহাসি হেসে বললেন, 'তা হয়তো হয়। কিন্তু তড়িৎবাবুকে খুন করার জন্য কী কারণ থাকতে পারে বলুন। মোটিভটা কোথায় ? তড়িৎবাবু ছিলেন মিস্টার সিংহরায়ের সেক্রেটারি, লেখাপড়া নিয়ে থাকতেন, পাঁচ বছর হল এখানে এসেছেন, কারুর সঙ্গে মেলামেশা নেই, এ বাড়ির লোকের বাইরে কারুর সঙ্গে আলাপ পরিচয়ও নেই। গুণ্ডা বদমাইশ ছাড়া তার উপর এ ধরনের আক্রমণ করবে কে ? এবং কেন করবে ?'

ফেলুদা ভুরু কুঁচকে চুপ করে রইল। বিশ্বাস বললেন, 'সাদাসিধে রাহাজানির ব্যাপারটা আপনাদের মতো শখের ডিটেকটিভদের অ্যাপিল করবে না জানি। তা বেশ তো, আপনি রহস্য চান, রহস্যও তো রয়েছে। বার করুন তো দেখি, তড়িৎবাবুর মতো লোক মাঝরাত্তিরে জঙ্গলে যায় কেন।'

শশাঙ্কবাবু চুপচাপ একটা আলাদা সোফায় বসেছিল। ফেলুদা যে কেন মাঝে মাঝে আড়চোখে ওঁর দিকে চাইছিল সেটা বুঝলাম না। মহীতোষবাবুর চেহারায় এখনও সেই ফ্যাকাসে ক্লান্ত ভাবটা রয়েছে। বার বার খালি মাথা নাড়ছেন আর বলছেন, 'কিছুই বুঝতে পারছি না...। কিছুই বুঝতে পারছি না...।'

আরও মিনিটখানেক বসে থেকে আমরা তিনজনে উঠে পড়লাম। মিস্টার বিশ্বাস বললেন, 'আপনি নিজের খুশি মতো তদন্ত চালিয়ে যেতে পারেন মিস্টার মিত্তির। তাতে আমি কিছু মাইন্ড করব না। হাজার হোক— ক্ষত চিহ্নটা তো আপনিই প্রথম দেখেছিলেন।'

বৈঠকখানা থেকে বেরিয়ে ফেলুদা দোতলায় গেল না। গাড়িবারান্দা দিয়ে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এসে ডান দিকে ঘুরে পুরনো আস্তাবল আর হাতিশালের পাশ দিয়ে একেবারে বাড়ির পিছন দিকে গিয়ে হাজির হলাম আমরা। পিছন ফিরে উপর দিকে চাইতেই দোতলার একসারি জানালার মধ্যে একটা থেকে দেখলাম লালমোহনবাবুর তোয়ালেটা ঝুলছে। এটা না হলে কোনটা যে আমাদের ঘর সেটা চেনা মুশকিল হত। আমাদের ঘরের ঠিক নীচেই একতলার একটা দরজা রয়েছে। এটাকে খিড়কি দরজা বলা যেতে পারে। এটা দিয়েই নিশ্চয় কাল রাত্রে বেরিয়ে তড়িৎবাবু জঙ্গলের দিকে গিয়েছিলেন।

সামনে বিশ-পঁচিশ হাত দূরে একটা খোলার চালওয়ালা ছোট্ট একতলা বাড়ি রয়েছে। তার সামনে আট-দশজন লোক জটলা করছে। তার মধ্যে একজনকে আমরা আগে দেখেছি। এ হল মহীতোষবাবুর দারোয়ান। বাড়িটাও সম্ভবত দারোয়ানেরই। ফেলুদার পিছন পিছন আমরা এগিয়ে গেলাম বাড়িটার দিকে। দূরে কালবুনির জঙ্গল দেখা যাচ্ছে, তার শাল গাছের মাথাগুলো অন্য গাছের উপর উঁচিয়ে রয়েছে। জঙ্গলের পিছনে দেখা যাচ্ছে ধোঁয়াটে নীল ঢেউ খেলানো পাহাড়ের সারি।

বাড়িটার কাছাকাছি পৌঁছতে দারোয়ান আমাদের সেলাম করল। ফেলুদা জিজ্ঞেস করল, 'তোমার নাম কী ?'

'চন্দন মিসির, হুজুর।'

বুড়ো লোক, মাথার চুলে কদম ছাঁট, পিছনে টিকি, চোখের পাশের চামড়া কুঁচকে গেছে। কথা বলার ঢং দেখেই বোঝা যায় খৈনি খায়।

'কদ্দিন কাজ করছ এখানে ?'

'পঁচাশ বরিস হইয়ে গেলো হুজুর।'

চন্দন মিসিরের কথায় বুঝলাম, তড়িৎবাবুর মৃত্যুর চেয়ে মানুষখেকো বাঘ নিয়ে এখানকার লোকেরা অনেক বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। পাগলা হাতি নাকি প্রায়ই বেরোয়, কিন্তু

মানুষখেকো বাঘ গত ত্রিশ বছরের মধ্যে এই প্রথম। চন্দনের মতে এখানে কিছু লোক বেআইনিভাবে চোরা শিকার করে, তাদের কারুর গুলিতে হয়তো বাঘটা জখম হয়েছিল, আর সেই থেকেই ওটা ম্যান-ইটার হয়ে গেছে। অনেক সময় বেশি বয়সে বাঘের দাঁত ক্ষয়ে গেলেও ওরা ম্যান-ইটার হয়ে যায়। আবার মাঝে মাঝে দেখা যায় যে শজারু ধরে খেতে গিয়ে তার কাঁটা এমনভাবে চোখে-মুখে ঢুকে গেছে যে, তার ফলে কাবু হয়ে বাঘ জানোয়ার ছেড়ে আরও সহজ শিকার মানুষের দিকে গেছে।

ফেলুদা বলল, 'এখানকার লোকেরা কি চাইছে যে মহীতোষবাবু বাঘটাকে মারুন?'

চন্দন মিসির তার মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, 'সে তো চাইবে, লেকিন বাবু তো এ জঙ্গলে শিকার করেননি কখনও। আসামে করিয়েছেন, ওড়িশায় করিয়েছেন—এ জঙ্গলে করেননি।'

খবরটা শুনে আমরা সকলেই অবাক হলাম। ফেলুদা বলল, 'কেন, এখানে করেননি কেন?'

চন্দন বলল, 'এই জঙ্গলে বাবুর দাদাজি (ঠাকুরদা) বাঘের হাতে মরলেন, বাবুর বাবা ভি বাঘের হাতে মরলেন, তাই বাবু এখানে না করে দুসরা জায়গা দুসরা জঙ্গলে চলে গেলেন।'

মহীতোষবাবুর বাবাও যে বাঘের হাতে মরেছিলেন সেটা এই প্রথম শুনলাম। ফেলুদা জিজ্ঞেস করাতে চন্দন বলল যে, মহীতোষবাবুর বাবা নাকি মাচা থেকে বাঘকে গুলি করেছিলেন, আর দেখে মনে হয়েছিল বাঘটা মরে গেছে। মিনিট দশেক পরে মাচা থেকে নেমে বাঘের দিকে যেতেই সেটা নাকি ভদ্রলোককে আক্রমণ করে সাংঘাতিকভাবে জখম করে। ক্ষত সেপটিক হয়ে কয়েক দিনের মধ্যেই নাকি ভদ্রলোক মারা যান।

খবরটা শুনে ফেলুদা কিছুক্ষণ ভুরু কুঁচকে মাটির দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর খোলার বাড়িটার দিকে দেখিয়ে বলল, 'তুমি ওই বাড়িতে থাক?'

'হাঁ, হুজুর।'

'রাত্তিরে ঘুমোও কখন?'

চন্দন প্রশ্নটা শুনে একটু থতমত খেয়ে ফেলুদার দিকে চাইল। ফেলুদা এবার আসল প্রশ্নে চলে গেল।

'কাল রাত্তিরে যে বাবু খুন হলেন—'

'তোড়িতবাবু?'

'হ্যাঁ। উনি বেশ বেশি রাত্তিরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে জঙ্গলের দিকে গিয়েছিলেন। তুমি তাকে যেতে দেখেছিলে কি?'

চন্দন মিসির বলল, গতকাল না দেখলেও তড়িৎবাবুকে সে তার আগের দিন, এবং তারও আগে বেশ কয়েক দিনই সন্ধেবেলা জঙ্গলের দিকে যেতে দেখেছে। গতকাল তড়িৎবাবুকে না দেখলেও আরেকজনকে দেখেছে।

কথাটা শুনে ফেলুদার মুখের ভাব বদলে গেল।

'কাকে দেখেছিলে?'

'তা জানি না হুজুর। তোড়িতবাবুর টর্চের মুখটা বড়—তিন সেলের পুরনো টর্চ। আর এটা ছিল ছোট টর্চ, তার মুখ ছোট। তবে তাই বলে আলো কম নয়।'

'তুমি কেবল আলোই দেখেছ? আর কিছু দেখনি?'

'নেহি হুজুর। আউর কুছ নেহি দেখা।'

ফেলুদা আরও কী বিষয়ে জানি একটা প্রশ্ন করতে যাচ্ছিল, এমন সময় দেখি মহীতোষবাবুর চাকর ব্যস্তভাবে দৌড়ে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে।

'বাবু আপনাদের ডেকেছেন। বললেন জরুরি দরকার।'

আমরা ফিরে এসে দেখি, মহীতোষবাবু গাড়িবারান্দায় দাঁড়িয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। ফেলুদাকে দেখামাত্র বললেন, 'আপনার অনুমান ঠিক। তড়িৎকে গুণ্ডা-বদমাইশে মারেনি।'

'কী করে জানলেন?'

'যে অস্ত্রটা দিয়ে তাকে মারা হয়েছিল সেটা আমাদেরই বাড়িতে ছিল। কাল যে তরোয়ালটা আপনাকে দেখিয়েছি, সেইটা। সেটা আর ঠাকুরদার আলমারিতে নেই।'

৭

কানাই চাকরটাই আদিত্যনারায়ণের ঘরে ধুনো দিতে গিয়ে তলোয়ারের অভাবটা লক্ষ করে, আর করেই মহীতোষবাবুকে খবর দেয়। ঘরে অনেক বইপত্তর আছে যেগুলো মহীতোষবাবুর লেখার কাজে দরকার হয় ; তাই আর ঘরটায় চাবি দেওয়া হত না। চাকর সবই পুরনো আর বিশ্বাসী। চুরি এ বাড়িতে বহুকাল হয়নি, তাই ও নিয়ে কেউ মাথাও ঘামাত না। তার মানে এই যে, বাড়ির যে-কেউ ইচ্ছে করলে ও তলোয়ার বার করে নিতে পারত।

আলমারিটা খুব ভাল করে পরীক্ষা করেও ফেলুদা কোনও ক্লু বা ওই জাতীয় কিছু পেল না। শুধু তলোয়ারটাই নেই, আর সব যেখানে যেমন ছিল সেইভাবেই আছে।

পরীক্ষা শেষ হলে পর ফেলুদা বলল যে, ও তড়িৎবাবুর শোবার ঘর, আর তড়িৎবাবু যেখানে কাজ করত সেই জায়গাটা একটু দেখতে চায়।—'তবে তার আগে আপনার মনে কোনওরকম সন্দেহ হচ্ছে কি না সেটা জানতে চাই।'

মহীতোষবাবু কিছুক্ষণ গম্ভীর থেকে মাথা নেড়ে বললেন, 'তড়িৎকে খুন করার কোনও কারণ থাকতে পারে এমন কোনও লোক তো এখানে আছে বলে মনে হয় না। ওর এমনিতেও মেলামেশা কম ছিল, কাজ নিয়ে থাকত ; মাঝে মাঝে হেঁটে বাইরে বেড়াতে যেত। যত দূর জানি, বদ অভ্যাস-টভ্যাসও কিছু ছিল না। আর ঠাকুরদার তলোয়ার দিয়েই যদি তাকে মেরে থাকে তা হলেও তো আমাদের বাড়িরই লোক। নাঃ, আমি তো ভেবে কূলকিনারা পাচ্ছি না।'

আমরা তিনজনে মহীতোষবাবুর সঙ্গে তড়িৎবাবুর ঘর দেখতে গেলাম। আমাদের ঘরেরই মতো বড় একটা ঘর। আসবাব ছাড়া তড়িৎবাবুর নিজের জিনিসপত্র বলতে নীল রঙের একটা বড় সুটকেস, একটা কাঁধে-ঝোলানো কাপড়ের ব্যাগ, আলনায় টাঙানো শার্ট প্যান্ট পায়জামা গেঞ্জি তোয়ালে ইত্যাদি, একটা তাকে প্রসাধনের জিনিসপত্র, একটা ছোট টেবিলের উপর রাখা ইংরেজি আর বাংলা কিছু গল্পের বই, একটা অ্যালার্ম ক্লক, একটা সুলেখা ব্লু-ব্ল্যাক কালি, আর দুটো পেনসিল। এ ছাড়া খাটের পাশে একটা টেবিলের উপর রাখা ফ্লাস্ক আর জলের গেলাস, আর একটা ছোট ট্রানজিস্টার রেডিয়ো।

সুটকেসটায় চাবি ছিল না। ফেলুদা সেটা খুলতেই দেখা গেল তার মধ্যে খুব পরিপাটি করে কাপড়চোপড় সাজানো রয়েছে। ফেলুদা বলল, 'ভদ্রলোক কলকাতায় যাবার জন্য তৈরিই হয়ে ছিলেন।'

মিনিট পাঁচেক পরে তড়িৎবাবুর ঘর থেকে আমরা মহীতোষবাবুর আপিস ঘরের দিকে রওনা দিলাম। যাবার পথে ফেলুদা মহীতোষবাবুকে জিজ্ঞেস করল, 'সেক্রেটারি বলতে ঠিক কী ধরনের কাজ করতেন তড়িৎবাবু, সেটা একটু বলবেন কি ?'

মহীতোষবাবু বললেন, 'চিঠিপত্র লেখার কাজ তো আছেই, তা ছাড়া আমার হাতের লেখা ভাল নয় বলে পাণ্ডুলিপি ও-ই কপি করে দিত। তারপরে প্রুফ দেখত, কলকাতায় গেলে পাবলিশারদের সঙ্গে দেখা করা, কথাবার্তা বলা, এ সবও করত। ইদানীং আমার বংশের ইতিহাস লেখার ব্যাপারে ওকে অনেক পুরনো বই কাগজপত্র দলিল চিঠি ইত্যাদি ঘাঁটতে হয়েছে। সে-সব পড়ে তথ্য নোট করে রাখত।'

'এগুলো বুঝি সেই সব নোটের খাতা ?' ফেলুদা তড়িৎবাবুর ডেস্কের উপর রাখা গোটা আষ্টেক বড় সাইজের খাতার দিকে দেখাল। মহীতোষবাবু মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' বললেন।

'আর এগুলো কি আপনার নতুন শিকার কাহিনীর প্রুফ ?'

লম্বা লম্বা কাগজের তাড়া, দেখলেই বোঝা যায় সেগুলো প্রুফ। ফেলুদা এক-তাড়া প্রুফ

তুলে নিয়ে উলটোপালটে দেখছিল।

'প্রুফ-দেখিয়ে হিসেবে কি খুব নির্ভরযোগ্য ছিলেন তড়িৎবাবু?'

প্রশ্নটা শুনে মহীতোষবাবু বেশ অবাক হয়েই বললেন, 'আমার তো তাই ধারণা। আপনার কি সন্দেহ হচ্ছে?'

'প্রথম পাতার প্রথম প্যারাগ্রাফেই দুটো ভুল দেখছি শুধরানো হয়নি।'

'তাই নাকি?'

'গর্জন কথাটার রেফ বাদ রয়ে গেছে, আর হরিণের র-এ ফুটকি নেই।'

'আশ্চর্য...আশ্চর্য...'

মহীতোষবাবু অন্যমনস্কভাবে প্রুফের কাগজগুলোর উপর চোখ বুলিয়ে ফেলুদাকে ফেরত দিয়ে দিলেন।

'সম্প্রতি তড়িৎবাবুকে কি চিন্তিত বা উদ্বিগ্ন বলে মনে হত আপনার ?' ফেলুদা প্রশ্ন করল।

'কই, সে রকম তো কিছু লক্ষ করিনি।'

ফেলুদা তড়িৎবাবুর কাজের টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে কী যেন দেখছে। একটা প্যাড খোলা রয়েছে, তার উপর হিজিবিজি লেখা। ফেলুদা প্যাডটা হাতে তুলে নিয়ে কাগজের উপর চোখ রেখে বলল, 'আপনাদের বংশের ইতিহাস লেখার জন্য কি মহাভারত ঘাঁটার দরকার হচ্ছিল ?'

'কেন বলুন তো ?'

'তড়িৎবাবু এই প্যাডে বোধহয় অন্যমনস্কভাবেই কয়েকটা কথা লিখেছেন। এই যে দেখুন না— অর্জুন, কীচক, নারায়ণী, উত্তর, অশ্বত্থামা। এরা সবই তো মহাভারতের নাম। নারায়ণী হল কৃষ্ণের সেনার নাম। কীচক ছিল বিরাট রাজার শালা, আর উত্তর হল বিরাটের ছেলে, অভিমন্যুর শালা।'

মহীতোষবাবু বললেন, 'আমার কাজের জন্য ওকে মহাভারত পড়তে হয়নি, তবে ব্যাপারটা কী জানেন, তড়িৎ ছিল বইয়ের পোকা। ঠাকুরদাদার লাইব্রেরিতে কালীপ্রসন্নর মহাভারত রয়েছে। সেটা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে থাকতে পারে।'

আমরা মহীতোষবাবুর আপিসঘর থেকে বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছি, এমন সময় একটা চেনা গুরুগম্ভীর গলায় থিয়েটারের ঢঙে ক'টা কথা কানে এল—

'সব ধ্বংস হয়ে যাবে...সব ধ্বংস হয়ে যাবে ! সত্যের ভিত টলমল করছে, সব ধ্বংস হয়ে যাবে !'

শুধু গলাটাই শুনলাম, মানুষটাকে দেখতে পেলাম না। মহীতোষবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'বৈশাখ মাসটা প্রতি বছরই দাদার এ রকম হয়। তারপর বর্ষা এলে গরমটা কমলে কিছুটা নিশ্চিন্ত।'

আমরা আমাদের ঘরের সামনে পৌঁছে গেছি। ফেলুদা বলল, 'কাল একবার জঙ্গলে যাব ভাবছিলাম। একটু অনুসন্ধানের প্রয়োজন। আপনি কী বলেন ?'

মহীতোষবাবু ভুরু কুঁচকে বললেন, 'তড়িৎকে যেখানে ফেলে রেখে গিয়েছিল বাঘ, তার কাছাকাছি সে আর আসবে না বলেই তো মনে হয়। বিশেষ করে দিনের বেলা। অন্তত বাঘ সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা তাই বলে। কাজেই আপনারা যদি ওই স্পটের কাছাকাছি থাকেন তা হলে বেশি রিস্ক নেই। সত্যি বলতে কী, এ জঙ্গলে যে বড় বাঘ এখনও রয়ে গেছে সেটাই তো আমার কাছে একটা বিরাট বিস্ময়।'

'সঙ্গে মাধবলালকে পাওয়া যাবে তো ? আর একটা জিপ... ?'

'নিশ্চয়ই।'

মহীতোষবাবু চলে গেলেন। বললেন, তলোয়ারের খবরটা ইনস্পেক্টর বিশ্বাসকে দিতে হবে।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। বিকেলের পর থেকে আকাশের মেঘ একদম কেটে গেছে। লালমোহনবাবু অনেকক্ষণ থেকে চুপচাপ ছিলেন ; দেখে মনে হচ্ছিল হয়তো কোনও গল্পের প্লট মাথায় আসছে, কারণ মাঝে মাঝে পকেট থেকে লাল টুকটুকে একটা টাটার ডায়েরি বার করে কী যেন নোট করছিলেন। ঘরে এসে পাখাটা খুলে দিয়ে খাটে বসে বললেন, 'কীরকম বোনাস পেয়ে গেলেন বলুন। এটা আমারই দৌলতে সেটা স্বীকার করছেন তো ?'

'একশোবার।'

ফেলুদা তড়িৎবাবুর ডেস্কের উপর থেকে সেই মহাভারতের নাম লেখা প্যাডটা আর

'কোচবিহারের ইতিহাস' বলে একটা বই নিয়ে এসেছিল। এখন সে খাটে বসে প্যাডের দিকে চেয়ে রয়েছে। কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বিড়বিড় করে বলল, 'সব ক'টাই মহাভারতের নাম তাতে সন্দেহ নেই, কেবল এই "উত্তর" কথাটা...। উত্তর...উত্তর। উত্তর নামও হতে পারে, উত্তরদিকও হতে পারে, আবার উত্তর মানে উত্তর কাল— পরবর্তীকাল— এও হতে পারে। আবার উত্তর মানে প্রশ্নের উত্তর... জবাব... জবাব...'

ফেলুদা হঠাৎ যেন চমকে উঠল। তারপর খাটের পাশের টেবিলের উপর থেকে নিজের খাতাটা নিয়ে সংকেতের পাতাটা খুলল।

'দিক পাও ঠিক ঠিক জবাবে।—থ্যাঙ্ক ইউ তড়িৎবাবু। আপনার উত্তর বিরাট রাজার ছেলে হতে পারে—আমার উত্তর হল উত্তরদিক। দিক পাও ঠিক ঠিক জবাবে। অর্থাৎ দিক পাও ঠিক ঠিক উত্তরে। তার মানে উত্তরদিকটাই হল ঠিক দিক। হাত গোন ভাত পাঁচ। পঞ্চান্ন হাত। উত্তরদিকে পঞ্চান্ন হাত। কিন্তু তারপর ? ফাল্গুন তাল জোড়, দুই মাঝে ভুঁই ফোঁড়। ফাল্গুন...এই ফাল্গুনটা নিয়েই যত গণ্ডগোল—'

আবার ফেলুদার সেই চমকে উঠে কথা থেমে যাওয়ার ব্যাপার।

'তড়িৎবাবুর টেবিলের উপর একটা বাংলা অভিধান ছিল না ?' সে চাপা গলায় বলে উঠল।

লালমোহনবাবু বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, সংসদের অভিধান। লাল রং। আমারও আছে।'

'ওটা দেখা দরকার।'

ফেলুদার পিছন পিছন আমরাও ছুটলাম মহীতোষবাবুর আপিস ঘরে।

অভিধান খুলে 'ফাল্গুন' বার করে ফেলুদার চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল।

'ফাল্গুন—ফাল্গুন হল অর্জুনের একটা নাম ! আর অর্জুন শুধু পঞ্চপাণ্ডবের একজন নয়, অর্জুন গাছও বটে। এ জঙ্গলে অর্জুন গাছ কালও দেখেছি।'

'তা হলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াচ্ছে ?' লালমোহনবাবু জিনিসটা ভাল করে না বুঝেও উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন।

'ফাল্গুন তাল জোড়, দুই মাঝে ভুঁই ফোঁড়। একটা অর্জুন গাছ আর জোড়া তাল গাছের মাঝখানে জমি খুঁড়তে হবে।'

'কিন্তু সে রকম গাছ কোথায় আছে সেটা জানছেন কী করে ?'

ফেলুদা বলল, 'আরেকটা কোনও বুড়ো গাছের উত্তরে পঞ্চাশ হাত গেলেই পাওয়া যাবে।'

'আরেব্বাবা, বুড়ো গাছ ! বুড়ো গাছ ছাড়া ছোক্‌রা গাছ আছে নাকি এ জঙ্গলে ? আর গাছ তো মশাই সব কেটে ফেলেছে। মহীতোষবাবুর নিজেরই তো কাঠের ব্যবসা। এ সংকেত লেখা হয়েছে কদ্দিন আগে ? সত্তর পঁচাত্তর বছর হবে না ?'

আমরা আমাদের ঘরে ফিরে এসেছি। ফেলুদা আবার চুপ, আবার গম্ভীর। মেঝেতে বাঘছালের দিকে চেয়ে রয়েছে অন্যমনস্কভাবে। প্রায় মিনিটখানেক ওইভাবে থেকে বলল, 'যা ভাবছি তাই যদি হয়, তা হলে বড় বাঘের ছালটা তড়িৎবাবুরই পাওয়া উচিত ছিল। সংকেত সমাধানের ব্যাপারে তড়িৎ সেনগুপ্ত ফেলু মিত্তিরের চেয়ে কম যায় না। থুড়ি, যেতেন না।'

লালমোহনবাবু বললেন, 'কিন্তু প্যাডে যে আরও সব মহাভারতের নাম রয়েছে ? কীচক, অশ্বত্থামা—এদের সঙ্গে সংকেতের কী সম্পর্ক ?'

'সেই কথাই তো আমিও ভাবছি...'

ফেলুদা আবার প্যাডের দিকে চাইল। তারপর বলল, 'অবিশ্যি এই কাগজের সব ক'টা

নামই যে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত, এটা ভাবার কোনও কারণ নেই। এবং এগুলো যে একই সময় লেখা সেটাও ভাবার কোনও কারণ নেই। এই দেখুন—কীচক আর নারায়ণী ডট পেন দিয়ে লেখা। দেখলেই বুঝতে পারবেন। কালির রং সবই এক বলে মনে হয়, কিন্তু অন্য লেখাগুলোর নীচের দিকের টান গুলো ঈষৎ মোটা— যেটা ডট পেনে কখনও হয় না।'

লালমোহনবাবু প্রায় গোয়েন্দার মতো করে কাগজটার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'তা হলে কীচক আর নারায়ণীর সঙ্গে সংকেতের—'

কথাটা শেষ হবার আগেই দরজার দিক থেকে গম্ভীর গলায় কথা এসে পড়ায় লালমোহনবাবু চমকে উঠে হাত থেকে প্যাডটা ফেলেই দিলেন।

'কীচকদের নিয়ে কথা হচ্ছে কি ?'

দেবতোষবাবু।

পর্দা ফাঁক হল। ভদ্রলোক ভিতরে ঢুকে এলেন। আবার সেই বেগুনি ড্রেসিং গাউন। ভদ্রলোকের কি আর কোনও জামা নেই ? ফেলুদা বলল, 'আসুন দেবতোষবাবু, ভিতরে আসুন।' ভদ্রলোক ফেলুদার কথায় কান না দিয়ে একটা প্রশ্ন করে বসলেন।

'পৃথুরাজা দিঘির জলে ডুবে আত্মহত্যা করেছিলেন কেন জান ?'

'আপনি বলুন। আমরা জানি না।' ফেলুদা বলল।

'কারণ কীচকদের সংস্পর্শে এসে পাছে ধর্মনাশ হয়, সেই ভয়ে।'

'কীচক একটা জাতির নাম ?' ফেলুদা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

'যাযাবর জাতি। জঙ্গলে গেলে একবার একটু খোঁজ করে দেখো তো তারা এখানে আছে কি না! বনমোরগ শিকার করত তীর-ধনুক নিয়ে।'

'নিশ্চয়ই দেখব খোঁজ করে', ফেলুদা খুব স্বাভাবিকভাবে বলল। তারপর বলল, 'আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি কি ?'

দেবতোষবাবু কেমন যেন অবাক ফ্যালফ্যালে ভাব করে ফেলুদার দিকে চাইলেন।

'জিজ্ঞেস করবে ? আমাকে তো কেউ জিজ্ঞেস করে না!'

'আমি করছি। এখানে প্রাচীন গাছ বলতে কোনও বিশেষ গাছ আছে কি ? আপনি স্থানীয় ইতিহাস ভাল করে জানেন বলেই আপনাকে জিজ্ঞেস করছি।'

'প্রাচীন গাছ ?'

'হ্যাঁ। মানে এমন গাছ, যাকে লোকে বুড়ো গাছ বলে জানে।'

'প্রাচীন গাছ' শুনে, দেবতোষবাবুর ঘোলাটে চোখ আরও ঘোলাটে হয়ে গিয়েছিল, এখন হঠাৎ জ্বলজ্বল করে উঠল।

'বুড়ো গাছ ? তাই বলো। প্রাচীন গাছ আর বুড়ো গাছ কি এক হল ? বুড়ো নাম তো শুধু বয়সে বুড়ো বলে নয়। গাছের গায়ে একটা ফোকর আছে, সেটা দেখতে ঠিক একটা ফোক্‌লাদাঁত বুড়োর হাঁ করা মুখের মতো। সেই গাছের নীচে ঠাকুরদাদার সঙ্গে গিয়ে চড়ুইভাতি করেছি। ঠাকুরদাদা বলতেন ফোক্‌লা ফকিরের গাছ।'

'গাছটা কী গাছ ?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

'কাটা ঠাকুরানীর মন্দির দেখেছ ? সে-ও রাজুর হাত থেকে নিস্তার পায়নি। সেই মন্দিরের পশ্চিমদিকে হল ফোক্‌লা ফকিরের গাছ। অশ্বত্থ গাছ। সেই গাছেই একদিন মহী—'

'দাদা, চলে এসো!'

দেবতোষবাবু কথা শেষ করতে পারলেন না। কারণ মহীতোষবাবু দরজার বাইরে থেকে তাঁর বাজখাঁই গলায় হাঁক দিয়েছেন। পর্দা আবার ফাঁক হল। মহীতোষবাবু গম্ভীর মুখ করে

ঘরে ঢুকলেন। বুঝলাম সেই কঠিন মানুষটা আবার বাইরে বেরিয়ে এসেছে।

'তোমার ওষুধ খাবার কথা ; খেয়েছ ?'

'ওষুধ ?'

'মন্মথ দেয়নি ?'

দেবতোষবাবুর জন্য একজন আলাদা চাকর আছে, নাম মন্মথ।

'আমি তো ভাল আছি, আবার ওষুধ কেন ? আমার মাথার যন্ত্রণা—'

মহীতোষবাবু তাঁর দাদাকে এক রকম জোর করেই ঘাড় ধরে ঘর থেকে বার করে নিয়ে গেলেন। বাইরে থেকে ছোট ভাইয়ের ধমক শুনতে পেলাম।

'ভাল আছ কি না-আছ সেটা ডাক্তার বুঝবে। তোমাকে যা ওষুধ দেওয়া হয়েছে, সেটা তুমি খাবে।'

গলা মিলিয়ে এল ; আর সেই সঙ্গে পায়ের শব্দও।

'ভদ্রলোককে সত্যিই কিন্তু আজ অনেকটা স্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছিল।' মন্তব্য করলেন লালমোহনবাবু। ফেলুদার কানে যেন কথাটা গেলই না। সে আবার বিড়বিড় শুরু করেছে।

'অশ্বত্থ গাছে...অশ্বত্থ গাছ...অশ্বত্থ...। কিন্তু মুড়ো হয় কেন ? মুড়ো হয় বুড়ো গাছ...মুড়ো হয়...'

হঠাৎ হাত থেকে খাতাটা প্রচণ্ড জোরে বিছানায় ফেলে দিয়ে ফেলুদা লাফিয়ে উঠে চিৎকার করে উঠল—'হয় ! হয় ! হয় ! হয় !'

'কী হয় ?' লালমোহনবাবু যথারীতি ভ্যাবাচ্যাকা।

'বুঝতে পারছেন না ? মুড়ো হয় বুড়ো গাছ। তার মানে বুড়ো গাছ, তার মুড়ো, মানে মুণ্ডু, অর্থাৎ গোড়া—হল হয়।'

'হল হয় ? সে আবার কী ?' লালমোহনবাবু আরও হতভম্ব। সত্যি বলতে কী, আমারও মনে হচ্ছিল ফেলুদা একটু আবোল তাবোল বকছে। এবার ফেলুদা যেন বেশ বিরক্ত হয়েই লালমোহনবাবুর দিকে চোখ পাকিয়ে গলা উঁচিয়ে বলল, 'আপনি না সাহিত্যিক ? "হয়" মানে জানেন না ? ঘোড়া, ঘোড়া, ঘোড়া। হয় মানে ঘোড়া। হয় মানে অশ্ব। বুড়ো গাছের গোড়া হল অশ্ব। আরও বলতে হবে ?'

'অশ্বত্থ !' চেঁচিয়ে উঠলেন লালমোহনবাবু।

'অশ্বত্থ। তড়িৎবাবু অশ্বত্থই লিখেছিলেন এমনি কলম দিয়ে, আর পরে খেয়ালবশত আ-কার আর মা জুড়ে দিয়েছেন ডট পেন দিয়ে। আর আমি ভাবছি মহাভারত। ছি ছি ছি ছি !'

৮

আমি জানি ফেলুদা কাল অনেক রাত অবধি ঘুমোয়নি। আমি আর লালমোহনবাবুও জেগে ছিলাম প্রায় এগারোটা অবধি। তড়িৎবাবুর মতো একজন আশ্চর্য বুদ্ধিমান লোক কী বিশ্রীভাবে ও কী রহস্যজনকভাবে মারা গেলেন সেই নিয়ে আলোচনা করছিলাম। কতকগুলো ব্যাপার যে ফেলুদাকেও রীতিমতো ধাঁধিয়ে দিয়েছিল সেটা বেশ বুঝতে পারছিলাম। ফেলুদা নিজেই সেগুলোর একটা লিস্ট করেছিল ; সেটা এখানে তুলে দিচ্ছি—

১। তড়িৎবাবু ছাড়া আর কে কাল রাত্রে জঙ্গলে গিয়েছিল ? যে গিয়েছিল সে-ই কি তলোয়ার নিয়েছিল ? সেই কি খুনি ? না সে ছাড়াও আরও কেউ গিয়েছিল ? হাল ফ্যাশানের

টর্চ কার কাছে আছে ?

২। প্রথম রাত্রে মহীতোষবাবু কার সঙ্গে ধমকের সুরে কথা বলছিলেন ?

৩। দেবতোষবাবু কাল মহীতোষবাবু সম্পর্কে কী ঘটনা বলতে যাচ্ছিলেন, সে সময় মহীতোষবাবু এসে তাঁকে ডেকে নিয়ে গেলেন ?

৪। দেবতোষবাবু সেদিন যুধিষ্ঠিরের রথের কথাটা বললেন কেন ? সেটা কি পাগলের প্রলাপ, না তার কোনও মানে আছে ?

৫। শশাঙ্কবাবু এত চুপচাপ কেন ? সেটা কি ওঁর স্বভাব, না বিশেষ কোনও কারণে উনি চুপ মেরে গেছেন ?

লালমোহনবাবু সব শুনেটুনে বললেন, 'মশাই, আমি কিন্তু একটি লোককে মোটেই ভরসার চোখে দেখতে পারছি না। ওই দাদা ব্যক্তিটি পাগল হতে পারেন, কিন্তু ওঁর হাতের কব্জিটা দেখেছেন ? মহীতোষবাবুর চেয়েও চওড়া। আর কালাপাহাড়ের উপর যা আক্রোশ দেখলাম, কাউকে কালাপাহাড় মনে করে ধাঁ করে একটা তলোয়ারের ঘা বসিয়ে দেওয়া কিছুই আশ্চর্য না।'

কথাটা শুনে ফেলুদা কিছুক্ষণ লালমোহনবাবুর দিকে চেয়ে থেকে বলল, 'আমার সঙ্গে মিশে আপনার কল্পনাশক্তি ও পর্যবেক্ষণক্ষমতা যে যুগপৎ বেড়ে চলেছে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। দেবতোষবাবু যে তলোয়ারের আঘাতে খুন করার ক্ষমতা রাখেন সেটা আমিও বিশ্বাস করি। তবে তড়িৎবাবুর খুনের পেছনে যে-ধরনের হিসেবি কার্যকলাপের ইঙ্গিত পাওয়া যায়— আদিত্যনারায়ণের আলমারি খুলে তলোয়ার নেওয়া, তড়িৎবাবুকে অনুসরণ করে এতখানি পথ হেঁটে জঙ্গলে যাওয়া—তাও আবার দুর্যোগের রাতে— তারপর অন্ধকারেই তাগ করে তলোয়ার চালানো—এটা মনে রাখতে হবে যে এক হাতে টর্চ জ্বেলে অন্য হাতে তলোয়ার চালানো সম্ভব নয়—এই এতগুলো কাজ একজন পাগলের পক্ষে সম্ভব কি না সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আসলে আরেকবার জঙ্গলে গিয়ে অনুসন্ধান না করলে চলছে না। যা ঘটেছে সব তো ওইখানে। কাজেই বাড়িতে বসে শুধু জল্পনা-কল্পনার সাহায্যে বেশি দূর এগোনো যাবে না। এটা ঠিক যে তড়িৎবাবু সংকেতের সমাধান করে গুপ্তধনের সন্ধানেই গিয়েছিলেন। গুপ্তধন নিয়ে সোজা কলকাতায় চলে যাবেন, এটাই ছিল তাঁর প্ল্যান। কিন্তু এমন একটা আরামের চাকরি ছেড়ে গুপ্তধনের প্রতিই বা তাঁর লোভটা গেল কেন ? ভদ্রলোককে তো রাজার হালে রেখেছিলেন মহীতোষবাবু। মাইনেও যে ভাল দিতেন সেটা তড়িৎবাবুর জামা-কাপড়, হাতের ঘড়ি, প্রসাধনের জিনিসপত্র ইত্যাদি দেখলেই বোঝা যায়। সিগারেটটাও খেতেন বিলিতি, এই মাগ্‌গির বাজারে।'

আজ সকাল থেকে আবার মেঘ করে আছে, তবে বৃষ্টি পড়ছে না। জানালা দিয়ে জঙ্গলটা চোখে পড়তেই কেমন যেন গা ছম ছম করে ওঠে। ফেলুদা সবেমাত্র বলেছে একবার মহীতোষবাবুর সঙ্গে দেখা হওয়া উচিত, এমন সময় চাকর এসে খবর দিল— নীচে ডাক পড়েছে। একটা জিপের আওয়াজ কিছুক্ষণ আগেই পেয়েছিলাম। নীচে গিয়ে দেখলাম ইনস্পেক্টর হাজির।

'আপনি খুশি তো ?' বিশ্বাস ফেলুদাকে দেখেই প্রশ্নটা করলেন।

'কেন ?'

'একটা রহস্য পেয়ে গেলেন। এই বাড়ি থেকেই অস্ত্র নিয়ে গিয়ে তড়িৎবাবুকে খুন করা হয়েছে, সেটা তো আপনার কাছে একটা জোর খবর, তাই নয় কি ?'

'অস্ত্র নেই মানেই যে সেটা দিয়ে খুন করা হয়েছে, এটা নিশ্চয়ই আপনি মনে করেন না !'

'আমি তা মনে করব কেন ? কিন্তু আপনি তাই ভাবছেন না কি ?'

দুজনেই বেশ ভদ্রভাবে কথা বললেও বেশ বুঝতে পারছিলাম যে দুজনের মধ্যে একটা চাপা রেষারেষি চলেছে। কোনও দরকার ছিল না ; মিস্টার বিশ্বাসই প্রথম ঠেস দিয়ে কথা বলেছেন। ফেলুদা একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, 'আমি এখনও কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছইনি। আর আপনি যদি মনে করেন যে আমি খুশি হয়েছি, তা হলে বলতে বাধ্য হব যে আপনার ধারণা ভুল। খুনের ব্যাপারে আমি কোনও দিনই খুশি না। বিশেষ করে তড়িৎবাবুর মতো একজন বুদ্ধিমান লোক এত অল্প বয়সে এভাবে প্রাণ হারাবেন, এতে খুশি হবার কী আছে মিস্টার বিশ্বাস ?'

'বুদ্ধিমান লোক ?' বিশ্বাস ঠাট্টার সুরে বললেন। 'বুদ্ধিমান লোকের এমন মতিভ্রম হবে কেন যে রাত দুপুরে বাঘের জঙ্গলে যাবে সফর করতে ? এর কোনও সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেন আপনি, মিস্টার মিত্তির ?'

'পারি।'

আমরা ছাড়া ঘরে তিনজন লোক— মহীতোষবাবু, বিশ্বাস আর শশাঙ্কবাবু। তিনজনেই ফেলুদার কথায় যেন তটস্থ হয়ে ওর দিকে চাইল। ফেলুদা বলল, 'তড়িৎবাবুর জঙ্গলে যাবার একটা পরিষ্কার কারণ ছিল।' এবার ফেলুদা মহীতোষবাবুর দিকে চাইল। 'আপনার সংকেতের মানে আমি বার করেছি মহীতোষবাবু— তবে আমারও আগে করেছিলেন তড়িৎ সেনগুপ্ত। কাজেই বাঘছালটা ওঁরই প্রাপ্য ছিল। আমার বিশ্বাস উনি জঙ্গলে গিয়েছিলেন গুপ্তধনের সন্ধানে।'

মহীতোষবাবুর চোখ কপালে উঠে গেছে দেখে ফেলুদা তাকে পুরো ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিল। ফোক্‌লা ফকিরের গাছের কথা শুনে মহীতোষবাবু অবাক হয়ে বললেন, 'কই, ও রকম কোনও গাছ আছে বলে তো জানি না।'

'কিন্তু আপনার দাদা যে বললেন ছেলেবেলায় আপনারা ওখানে চড়ুইভাতি করতে যেতেন, আপনার ঠাকুরদার সঙ্গে ?'

'দাদা বললেন ?' মহীতোষবাবুর কথায় পরিষ্কার ব্যঙ্গের সুর। 'দাদা যা বলেন তার কতটা সত্যি কতটা কল্পনা তা আপনি জানেন ? আপনি ভুলে যাচ্ছেন যে দাদার মাথার ঠিক নেই।'

ফেলুদা চুপ করে গেল। দেবতোষবাবুর মাথার ব্যারাম নিয়ে তারই আপন ভাইয়ের সঙ্গে সে কীভাবে তর্ক করবে ?

এদিকে মহীতোষবাবু কিন্তু বেশ ফ্যাকাসে হয়ে গেছেন। হাত কচলাতে কচলাতে বললেন, 'তার মানে তড়িৎ গুপ্তধন নিয়ে কলকাতায় পালানোর মতলব করছিল। হয়তো আর ফিরেও আসত না। অথচ আমি এর কিছুই জানতে পারিনি।'

মিস্টার বিশ্বাস সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বাঁ হাতের তেলোতে ডান হাত দিয়ে একটা ঘুঁষি মেরে বললেন, 'যাক, তা হলে ভদ্রলোকের বনে যাবার একটা কারণ পাওয়া গেল। এবার জানা দরকার আততায়ী কে।'

'এই বাড়িরই লোক তাতে বোধহয় সন্দেহ নেই। আছে কি ?' ফেলুদা একটা ধোঁয়ার রিং ছেড়ে জিজ্ঞেস করল।

মিস্টার বিশ্বাস একটা বাঁকা হাসি হেসে চোখ দুটোকে ছোট ছোট করে বললেন, 'তা তো বটেই। তবে এ বাড়ির লোক বলতে আপনিও কিন্তু বাদ যাচ্ছেন না, মিস্টার মিত্তির। আপনি নিজে তলোয়ারটা দেখেছিলেন। ওটা হাত করার সুযোগ এ বাড়ির অন্য বাসিন্দাদের যেমন ছিল, তেমনই আপনারও ছিল। আপনি তড়িৎবাবুকে আগে থেকে জানতেন কি না, তার প্রতি আপনার কোনও আক্রোশ ছিল কি না, সে সব কিন্তু কিছুই জানা যায়নি।'

মিস্টার বিশ্বাসের কথায় ফেলুদা আর একটা ধোঁয়ার রিং ছেড়ে বলল, 'কেবল দুটো জিনিস

সকলেই জানে। এক, আমি এখানে আমন্ত্রিত হয়ে এসেছি, এমনিতে আসার কথা ছিল না ; দুই, তড়িৎবাবু যে ছুরির আঘাতে মরে থাকতে পারেন সেদিকে আমিই প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করি। না হলে তাকে বাঘের শিকার বলেই চালিয়ে দেওয়া হচ্ছিল।'

মিস্টার বিশ্বাস এবার একটা হালকা হাসি হেসে বললেন, 'আপনি আমার কথাটা এত সিরিয়াসলি নিচ্ছেন কেন ? ভয় নেই, আমাদের লক্ষ্য আপনার দিকে নয়, অন্য দিকে।'

লক্ষ করলাম যে, কথাটা বলার পর বিশ্বাস আর মহীতোষবাবুর মধ্যে, যাকে বলে দৃষ্টি বিনিময়, সে রকম একটা ব্যাপার ঘটে গেল— বোধহয় এক সেকেন্ডের জন্য। ফেলুদা বলল, 'আপনি কালকে যে কথাটা বলেছিলেন, সেটা এখনও বলছেন তো ?'

'কী কথা ?' জিজ্ঞেস করলেন মিস্টার বিশ্বাস।

'আমি আমার ইচ্ছেমতো অনুসন্ধান চালিয়ে যেতে পারি তো ?'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। কেবল আমার আর আপনার কাজটা ক্ল্যাশ না করলেই ভাল। কেউ কারুর বাধা সৃষ্টি করলেই কিন্তু মুশকিল হবে।'

'সেটার বোধহয় কোনও সম্ভাবনা নেই। আমি জঙ্গলের দিকটাতেই তদন্ত চালাব প্রধানত। সে ব্যাপারে বোধহয় আপনার খুব একটা উৎসাহ নেই।'

'এনিথিং ইউ লাইক'—বললেন মিস্টার বিশ্বাস।

এবার ফেলুদা মহীতোষবাবুর দিকে ফিরল।

'দেবতোষবাবুর সঙ্গে কথা বলে কোনও ফল হবে না বলছেন ?'

মহীতোষবাবু অধৈর্য হলেন কি না জানি না, তবে মনে হল একবার যেন ওঁর চওড়া চোয়ালের হাড়টা একটু শক্ত হল। পরমুহূর্তেই আবার স্বাভাবিক হয়ে শান্ত গম্ভীর গলায় বললেন, 'দাদার শরীরটা কাল থেকে একটু বেশি খারাপ হয়েছে। ওঁকে ডিসটার্ব করাটা ঠিক হবে না।'

ফেলুদা ছাইদানে সিগারেট ফেলে দিয়ে সোফা ছেড়ে উঠে বলল, 'আমি তো আর অনির্দিষ্টকাল আপনার অতিথি হয়ে থাকতে পারি না, বা থাকতে চাইও না। কালই আমাদের মেয়াদের শেষ দিন। আপনাকে বলেছিলাম একবার জঙ্গলে যেতে চাই। আপনি যদি একটু মাধবলালকে বলে দেন, আর আপনার একটা জিপ...'

দুটোর ব্যবস্থাই হয়ে গেল। এখন সাড়ে আটটা। ঠিক হল আমরা দশটা নাগাদ বেরিয়ে পড়ব। জঙ্গলে ঘোরার জন্য হান্টিং বুট ছিল আমার আর ফেলুদার ; আমরা দুজনেই সেগুলো বার করে পরে নিলাম, যদিও জানি যে আমাকে হয়তো জিপ থেকে নামতেই দেবে না। আমার ধারণা ছিল লালমোহনবাবু হয়তো নিজে থেকেই নামতে চাইবেন না, কিন্তু এখন লালমোহনবাবুর হাবভাব দেখে বেশ অবাক লাগল। বাথরুমে গিয়ে ধুতি ছেড়ে খাকি প্যান্ট পরে এলেন, আর বাক্স থেকে একটা জবরদস্ত বুট জুতো বার করে নিয়ে সেটা পরতে লাগলেন। ফেলুদা ব্যাপারটা শুধু একবার আড়চোখে দেখে নিল, মুখে কিছু বলল না।

'আচ্ছা, বাঘের চাহনি শুনেছি নাকি সাংঘাতিক ব্যাপার ? সত্যি নাকি মশাই ?' বুট পায়ে দিয়ে মেঝের উপর মিলিটারি মেজাজে পায়চারি করতে করতে প্রশ্ন করলেন লালমোহনবাবু। ফেলুদা তৈরি হয়ে জানালার ধারে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে, এখন শুধু জিপ আর শিকারির অপেক্ষা। সে লালমোহনবাবুর প্রশ্নের জবাবে বলল, 'তা তো বটেই ; তবে শিকারিরা এটাও বলে যে বাঘ নাকি মানুষকে ভয় পায়। একজন লোক যদি বাঘ দেখলে পরে তার চোখে চোখ রেখে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারে, তা হলে বাঘ নাকি উলটো-মুখে ঘুরে চলে যায়। আর শুধু চাহনিতে যদি কাজ না দেয়, তা হলে হাত-পা ছুঁড়ে চেঁচাতে পারলেও নাকি একই ফল হয়।'

'কিন্তু ম্যান-ইটার ?'

'সেখানে আলাদা ব্যাপার।'

'তাই বলুন। কিন্তু তা হলে আপনি যে... ?'

'আমি যাচ্ছি কেন ? তার কারণ দিনের বেলা বাঘ বেরোবার সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে। যদি বেরোয় তার জন্য বন্দুক তো সঙ্গেই থাকছে। আর তেমন বেগতিক দেখলে জিপ তো রয়েইছে, উঠে পড়লেই হল।'

এর পরে জিপ আসার আগে লালমোহনবাবু শুধু একটা কথাই বলেছিলেন।

'খুনের ব্যাপারটা কিছু বুঝতে পারছি না মশাই। একেবারে টোটাল ডার্কনেস।'

ফেলুদা বলল, 'অন্ধকারটা যাতে না দূর হয় তার জন্য চেষ্টা চলছে লালমোহনবাবু। সেই চেষ্টাকে বিফল করাই হবে আমাদের লক্ষ্য।'

৯

যেখানে তড়িৎবাবুর মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল, আমরা সেইখানে এসে দাঁড়িয়েছি। সেদিনও এই সময়টাতেই এসেছিলাম, কিন্তু আজ কিছুক্ষণ হল মেঘ কেটে গিয়ে রোদ ওঠার ফলে আলোটা অনেক বেশি। এখানে ওখানে পাতার ফাঁক দিয়ে রোদ মাটিতে পড়েছে, আর লক্ষ করছি সেদিনের চেয়ে পাখিও ডাকছে অনেক বেশি। লালমোহনবাবু অবিশ্যি যে কোনও পাখি ডেকে উঠলেই, সেটাকেই বাঘ কাছাকাছি থাকার লক্ষণ বলে মনে করছেন।

তড়িৎবাবুর মৃতদেহ সেদিনই সকালে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কলকাতায় টেলিফোন করে খবর দেওয়াতে ওঁর বড় ভাই এসেছিলেন, শেষ কাজ তিনিই করে দিয়ে গেছেন। আজ আর সেই বাঁশঝাড়টার আশেপাশে সেদিনকার সাংঘাতিক ঘটনার কোনও চিহ্নই নেই। কিন্তু তাও ফেলুদা অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে চারদিকের জমি পরীক্ষা করছে। মাধবলালও ফেলুদার সঙ্গে কাজে লেগে গেছে। মনে হল বেশ উৎসাহই পাচ্ছে। লোকটাকে যত দেখছি ততই ভাল লাগছে। চেহারাটাও বেশ। হাসলেই গালের দু পাশে দুটো খাঁজ পড়ে, আর ভুরু না কুঁচকালেও কপালে পাঁচ-ছ'টা লাইন পড়েই আছে। জিপে আসতে আসতে ও বলছিল, বনবিভাগ থেকে মানুষখেকোর খবর ছড়িয়ে পড়ার পর থেকে এর মধ্যেই বেশ কয়েকজন শিকারি নাকি বাঘটা মারার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। তার মধ্যে কার্সিয়াং-এর এক চা বাগানের ম্যানেজার মিস্টার সাপ্রু নাকি আজকালের মধ্যেই এসে পড়বেন। সাপ্রু নামকরা শিকারি, তেরাইয়ের জঙ্গলে নাকি এককালে অনেক বাঘ মেরেছেন। মাধবলাল নিজেই অনেক বাঘ হরিণ বুনো শুয়োর ইত্যাদি মেরেছে, তারই একটি গল্প সে সবে বলতে আরম্ভ করেছে, এমন সময় ফেলুদা হঠাৎ বাঁশঝাড়ের দিক থেকে তার নাম ধরে ডাক দিল। মাধবলাল ব্যস্তভাবে এগিয়ে গেল ফেলুদার দিকে, তার পিছন পিছন আমরাও। এটা বলা দরকার যে আমাদের দুজনের জিপ থেকে নামার ব্যাপারে ফেলুদা আজ কোনও আপত্তি করেনি।

ফেলুদা মাটিতে উবু হয়ে বসে একটা বাঁশের গোড়ার দিকে চেয়ে আছে।

'দেখুন তো এটা কী ব্যাপার,' ফেলুদা মাধবলালকে উদ্দেশ করে বলল।

মাধবলাল ঝুঁকে পড়ে এক ঝলক দেখেই বলল, 'বুলেট লাগা থা।'

মাধবলালের পদবি দুবে, বাড়ি সাহেবগঞ্জ, কিন্তু বাংলা বুঝতে বা বলতে কোনও অসুবিধা হয় না।

বাঁশটার গায়ে যে একটা ক্ষতচিহ্ন রয়েছে সেটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। লালমোহনবাবু অবাক

হয়ে আমার দিকে চাইলেন। ফেলুদাও যে অবাক সেটা বোঝাই যাচ্ছে। বার তিনেক অসহিষ্ণুভাবে নিজের হাতের তেলোতে ঘুঁষি মেরে বলল, 'দাগটা পুরনো কি টাটকা সেটা বলতে পারেন ?'

মাধবলাল বলল, 'দিন দুয়েকের বেশি পুরনো হতেই পারে না।'

'ব্যাপারটা কী ?...ব্যাপারটা কী ?...' ফেলুদা বিড়বিড় করে বলল, 'বন্দুক...তলোয়ার...সব যে গণ্ডগোল হয়ে যাচ্ছে। তড়িৎবাবুকে মারল তলোয়ারের খোঁচা, বাঘকে মারল গুলি...সে গুলি তো আবার মনে হচ্ছে বাঘের গায়ে লাগেনি। নাকি—'

মাধবলাল বাঁশঝাড়ের নীচ থেকেই কী যেন কুড়িয়ে নিয়েছে। এমনি চোখে ভাল দেখাই যায় না। কাছে গিয়ে বুঝতে পারলাম, ইঞ্চি দুয়েক লম্বা লম্বা কতকগুলো রোঁয়া।

'বাঘের লোম কি ?' বলল ফেলুদা।

'বাঘের লোম', বলল মাধবলাল। 'গুলি বাঘের গা ঘেঁষে গিয়েছিল বলে মনে হয়।'

'আর তাই কি বাঘ খানিকটা মাংস খেয়েই পালিয়েছিল ?'

'সেই রকমই মালুম হচ্ছে।'

ফেলুদা দু-এক পা করে এগিয়ে যেতে শুরু করল। মাধবলালও হাতে বন্দুক নিয়ে দৃষ্টি সজাগ রেখে তাকে অনুসরণ করল। আমরা দুজনের মাঝামাঝি সবচেয়ে নিরাপদ জায়গাটা বেছে নিলাম। ফেলুদার পকেটে রিভলভার আছে জানি, আর তাতে টোটাও ভরা আছে। কিন্তু তাতে তো আর বাঘের কিছু হবে না। পিছন থেকে একটা গাড়ির আওয়াজ শুনে বুঝলাম, আমাদের সঙ্গে সঙ্গে জিপটাও এগোচ্ছে। তার ফলে ব্যবধান কিছুটা কমলেও জিপ আমাদের কাছে আসতে পারবে না, কারণ আমরা রাস্তা ছেড়ে জঙ্গলের ভিতর চলে এসেছি।

মিনিট তিনেক এভাবে হাঁটার পর ফেলুদা হঠাৎ কী যেন দেখে ডান দিকে কোনাকুনিভাবে দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল।

একটা কাঁটা-ঝোপ। তার মধ্যে একটা কাপড়ের টুকরো আটকে রয়েছে। সবুজ কাপড়। নিঃসন্দেহে তড়িৎবাবুর শার্টের অংশ। মাধবলাল না বললেও আন্দাজ করেছিলাম, বাঘ তড়িৎবাবুকে মুখে করে নিয়ে যাবার সময় ঝোপের কাঁটায় তড়িৎবাবুর শার্টের একটা অংশ ছিঁড়ে আটকে গিয়ে এই চিহ্ন রেখে গেছে।

এবার দেখলাম মাধবলাল আমাদের ছাড়িয়ে নিজেই এগিয়ে গেল। বুঝলাম সে-ই এবার পথ দেখাবে, কারণ সে আন্দাজ করেছে বাঘ কোন পথে এসেছিল। বোধহয় আমাদের কথা ভেবেই মাধবলাল ধীরে ধীরে এগোচ্ছে, কারণ চারদিকে কাঁটা-ঝোপ।

সামনে একটা তেঁতুল গাছ। তার গুঁড়ির কাছ থেকে জমিটা ঢালু হয়ে পিছন দিকে নেমে গেছে বলেই বোধহয় সেখানটা শুকনো রয়েছে। মাধবলাল সেখানে পৌঁছে থেমে গেল, তার দৃষ্টি মাটির দিকে। আমরাও এগিয়ে গেলাম।

যদিও এ জিনিসটা এর আগে কোনও দিন দেখিনি, তাও বুঝতে অসুবিধা হল না যে, আমরা বাঘের পায়ের ছাপ দেখছি। আমরা যেদিকে যাচ্ছি সেই দিকেই গেছে ছাপগুলো।

কাঁপা ফিসফিসে গলায় লালমোহনবাবুর প্রশ্ন এল, 'এ কি দু-পেয়ে বাঘ নাকি মশাই ?'

মাধবলাল হেসে উঠল। ফেলুদা বলল, 'এইভাবেই বাঘ হাঁটে। সামনের পা আর পিছনের পা ঠিক একই জায়গায় ফেলে, তাই মনে হয় দু পায়ে হাঁটছে।'

মাধবলাল এগিয়ে চলেছে, আমরা তার পিছনে। জিপের আওয়াজ আর পাচ্ছি না। বোধহয় হাল ছেড়ে দিয়ে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়েছে। একটা কুলকুল শব্দ পাচ্ছি। একটা নালা জাতীয় কিছু আছে বোধহয় কাছাকাছির মধ্যে। লালমোহনবাবুর নতুন বুটটা প্রথম দিকে বড্ড বেশি মচমচ শব্দ করছিল, তাতে ফেলুদা মন্তব্য করেছিল, সেটা নাকি

ম্যান-ইটারের কৌতূহল উদ্রেক করার পক্ষে আইডিয়াল, কিন্তু এখন কাদায় ভিজে আওয়াজটা প্রায় মরে এসেছে।

একটা শিমুল গাছ পেরিয়ে কয়েক পা যেতেই মাধবলাল আবার দাঁড়িয়ে পড়ল।

'আপকা পাস রিভলভার হ্যায় না ?'

এবার আমাদের চোখ গেল হাত বিশেক দূরে সামনের ঘাসের দিকে। ঘাসগুলো চিরে কী যেন একটা জিনিস এগিয়ে আসছে।

'ক্রেইৎ', বলল মাধবলাল।

নামটা জানি। অসম্ভব বিষধর সাপ।

এবার সাপটাকে দেখতে পেলাম। চলা থামিয়ে স্থির হয়ে ঘাসের উপর দিয়ে মাথাটা তুলে আমাদের দেখছে। ফণা নেই। সারা গায়ে হলদে আর কালো ডোরা।

ফেলুদা যে কখন রিভলভারটা বার করল টেরই পেলাম না। হঠাৎ একটা কানফাটা শব্দের সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম সাপের মাথাটা থেঁতলে গেল। আর একটা গুলি। এবার সব স্থির। গাছ থেকে পাখি ডেকে উঠেছে। দূরে আরেকটা গাছ থেকে বাঁদরের কিচির মিচির। মাধবলাল শুধু বলল, 'সাবাস', আর লালমোহনবাবু হাঁচি হাসি আর কাশি মিলিয়ে একটা অদ্ভুত শব্দ করে একদম চুপ মেরে গেলেন।

ফেলুদা বাঁ দিকে যাচ্ছে দেখে মাধবলাল বারণ করল। বলল, ওদিকে একটা নালা আছে, সেটা পেরোলেই নাকি একটা উঁচু পাথুরে ঢিবি আর অনেকগুলো বড় বড় পাথরের চাঁই। ওখানে নাকি বাঘের বিশ্রামের খুব ভাল জায়গা রয়েছে, কাজেই ওদিকটায় যাওয়া খুব নিরাপদ নয়। অগত্যা ফেলুদা মাধবলালের নির্দেশ মতো সোজাই চলল।

বন যে সব জায়গায় সমান ঘন, তা নয়। বাঁ দিকে চাইলেই বোঝা যায় ওদিকে নালা থাকার দরুন বন পাতলা হয়ে গেছে। জানোয়ারের মধ্যে এক বাঁদরই দেখা যাচ্ছে মাঝে মাঝে— ল্যাজ পাকিয়ে গাছের ডাল থেকে দোল খাচ্ছে, এ গাছ থেকে ও গাছে দিব্যি লাফিয়ে চলে যাচ্ছে, আর আমাদের দেখলে দাঁত খিঁচোচ্ছে।

ফেলুদা নিশ্চয়ই আশা করছিল যে, আরও অনুসন্ধান করলে আরও কিছু পাবে, কিন্তু এবারে পাওয়াটা জুটে গেল লালমোহনবাবুর কপালে। লালমোহনবাবুর বুটের ঠোক্কর খেয়ে একটা জিনিস ছিটকে প্রায় দশ হাত দূরে গিয়ে পড়তেই আমাদের চোখ সেদিকে গেল।

একটা গাঢ় ব্রাউন রঙের চামড়ার মানিব্যাগ। ফেলুদা সেটা খুলতেই তার ভিতর থেকে দুটো একশো টাকার নোট আর বেশ কিছু অন্য ছোট ছোট নোট বেরিয়ে পড়ল। এসব ছিল বড় খাপটায়। অন্য খাপ থেকে কয়েকটা রং চটে যাওয়া কুড়ি পয়সার ডাকটিকিট, দু-একটা ক্যাশ মেমো আরেকটা ওষুধের প্রেসক্রিপশন বেরোল। বৃষ্টিতে ভিজে ব্যাগটার অবস্থা বেশ শোচনীয় হলেও নোটগুলো এখনও দিব্যি ব্যবহার করা চলে।

ফেলুদা সব জিনিস আবার ব্যাগের মধ্যে পুরে ব্যাগটা শার্টের বুকপকেটে ঢুকিয়ে নিল।

আমরা আবার এগিয়ে চললাম।

এদিকটায় জঙ্গল বেশ ঘন হয়ে উঠেছে। চারিদিকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শাল গাছ, মাঝে মাঝে অন্য গাছ— সেগুন, শিমুল, আম, কাঁঠাল, ছাতিম। অর্জুন গাছও রয়েছে এখানে সেখানে। আমি জানি ফেলুদা সেগুলোর দিকে বিশেষভাবে চোখ রাখছে, আর এও জানি যে অর্জুনের কাছাকাছি কোনও তাল গাছ এখনও পর্যন্ত চোখে পড়েনি। মাধবলাল এরই মধ্যে এক ফাঁকে পকেট থেকে একটা ছুরি বার করে দুটো গাছের ডাল কেটে আমাকে আর লালমোহনবাবুকে দিয়েছে ; আমরা সেগুলো লাঠি হিসাবে ব্যবহার করছি। ফেলুদা হাঁটতে হাঁটতেই মাধবলালকে প্রশ্ন করল, 'বাঘের পায়ের ছাপ দেখে বাঘ সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানা যায়, তাই না ?'

মাধবলাল বলল, 'হ্যাঁ, এটাকে বেশ বড় বাঘ বলেই তো মনে হয়।'

আমি মনে মনে ভাবছিলাম— একটা আস্ত মানুষের লাশ মুখে করে বাঘটা এতখানি পথ এসেছে, তার মানে, কী সাংঘাতিক শক্তি বাঘের! অবিশ্যি মানুষের আর কীই বা ওজন। গোরু মোষ মেরেও তো শুনেছি বাঘ ওইভাবেই মুখে করে নালা টালা লাফিয়ে ডিঙিয়ে মাইলের পর মাইল পথ চলে যায়। মহীতোষবাবুর বইতেই নাকি আছে যে বাঘের ছাল ছাড়ালেই দেখা যায় ভিতরে কেবল মাস্‌ল আর মাস্‌ল।

ফেলুদা এবার আর একটা প্রশ্ন করল মাধবলালকে।

'মহীতোষবাবু এ জঙ্গলে কখনও শিকার করেননি। তাই না?'

মাধবলাল বলল, মহীতোষবাবুর কুসংস্কারের কথাটা সে জানে। তবে এ রকম কুসংস্কার নাকি অনেক শিকারির মধ্যেই দেখা যায়। 'আমার নিজের নেই', মাধবলাল বলল, 'তবে আমার বাবার ছিল। জোয়ান বয়সে একবার বাঘ মারতে যাবার আগে হাতে বিছুটি লেগেছিল, আর সেই দিনই একটা প্রায় দশ ফুট লম্বা বাঘকে বন্দুকের এক গুলিতে ঘায়েল করেছিলেন। সেই থেকে বাঘ মারতে যাবার আগে হাতে বিছুটি ঘষে নিতেন।'

ফেলুদা বলল, 'করবেটসাহেবেরও কুসংস্কার ছিল। ম্যান-ইটার মারতে যাবার দিন সকালে একটা সাপ দেখলে তার মনটা খুশি হয়ে যেত।'

মহীতোষবাবুর বাপ-ঠাকুরদা দুজনেই এ জঙ্গলে বাঘের হাতে প্রাণ দেন, কাজেই মহীতোষবাবুর পক্ষে এখানে শিকার করায় আপত্তিটা খুব স্বাভাবিক।

আমরা মাধবলালের পিছন পিছন প্রায় কুড়ি মিনিট ধরে হাঁটার পর ফেলুদা আসলে যে জিনিসটা খোঁজার জন্য এসেছিল, সেটা পেয়ে গেল। হালকা বেগুনি রঙের ছোট ছোট ফুলে ভরা একটা ঝোপের ধারে পড়ে আছে, তার পাথর-বসানো হাতলটা খালি দেখা যাচ্ছে, ইস্পাতের অংশটা ঝোপে ঢাকা।

আদিত্যনারায়ণের তলোয়ার!

জিনিসটা চোখে পড়তেই ফেলুদা প্রায় বাঘের মতোই নিঃশব্দে ঝাঁপিয়ে পড়ে তলোয়ারটা মাটি থেকে তুলে নিল।

খুব মন দিয়ে দেখলে বোঝা যায় তলোয়ারের ডগায় এখনও খয়েরি রঙের রক্তের দাগ।

ফেলুদা তলোয়ারটা হাতে নিয়ে এদিক ওদিক ঘুরিয়ে দেখে বলল, 'তার মানে খুনের জায়গাটা এর চেয়ে খুব বেশি দূরে নয়। আরও একটু এগোনো যায় কি, মাধবলালজি?'

মাধবলাল বলল, 'আর একশো গজ গেলে তো মন্দির পড়বে।'

'কী মন্দির?'

'এখানে বলে কাটা ঠাকুরানীর মন্দির। ভিতরে কিছু নেই। শুধু দালানটা ভাঙাচোরা অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে।'

কাটা ঠাকুরানীর মন্দিরের কথা কালই বিকেলে শুনেছি। দেবতোষবাবুর কাছে। ওরই পশ্চিমে ফোকলা ফকিরের গাছ।

ফেলুদা আর কিছু না বলে এগিয়ে চলল, তার হাতে আদিত্যনারায়ণের তলোয়ার। দেখে মনে হয় সেও যেন শের শা-র মতোই তলোয়ার হাতে বাঘ মারতে চলেছে।

কাটা ঠাকুরানীর মন্দির যে বহুকালের পুরনো সেটা দেখলেই বোঝা যায়। তার ফাটল থেকে অশথ গাছের চারা বেরিয়েছে। তার মাথাটাকে পাশের একটা বটগাছের ঝুরি নেমে আঁকড়ে ধরে পিষে যেন তার প্রাণটাকে বের করে দিয়েছে। ফেলুদা কিন্তু মন্দিরের দিকে দেখছিলই না। তার চোখ চলে গেছে মন্দিরের ডান দিকে। প্রায় বিশ হাত দূরে সত্যিই

একটা প্রকাণ্ড বুড়ো অশ্বত্থ গাছ শুকনো ডালপালা মেলে দাঁড়িয়ে আছে। গাছে পাতা প্রায় নেই বললেই চলে। যেটা আছে সেটা হল মাটি থেকে প্রায় এক-মানুষ উঁচুতে একটা ফোকর।

ফেলুদার পিছন পিছন আমরাও প্রায় নিশ্বাস বন্ধ করে গাছটার দিকে এগিয়ে যেতে ক্রমে ফোকরের চারিদিক ঘিরে গাছের গায়ের ছোপ-ছোপ এবড়ো-খেবড়ো শিরা উপশিরা সব মিলিয়ে একটা দাড়িওয়ালা বুড়োর চেহারা আমাদের চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠল। দাড়িটা গজিয়েছে যেন ফোকরের ঠিক নীচে। হাঁ করা ফোকলা বুড়োর সঙ্গে আশ্চর্য মিল।

ফেলুদার দৃষ্টি আবার ঘুরে গেল।

'ওই দিকটা উত্তরদিক কি ?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল মাধবললালকে।

'হ্যাঁ—ওটাই উত্তর।'

'হতেই হবে। ওই তো অর্জুন গাছ। আর ওই যে জোড়া তাল।'

অবাক হয়ে দেখলাম, সংকেতের নির্দেশের সঙ্গে সব হুবহু মিলে যাচ্ছে।

'পঞ্চান্ন হাতই হবে। সেখানেও ভুল নেই', বলে ফেলুদা অর্জুন গাছটার দিকে এগিয়ে গেল।

গাছটার কাছে পৌঁছে জোড়া তাল গাছ লক্ষ্য করে খানিক দূরে এগোতেই একটা ঝোপড়ার পিছনে জল-কাদায় ভরা একটা বেশ বড় গর্ত চোখে পড়ল। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে গর্তটা এই কয়েকদিন আগেই খোঁড়া হয়েছে।

আর এটাও বোঝা যাচ্ছে যে তার ভিতর থেকে একটা হাঁড়ি-টাড়ি গোছের জিনিস বার করে নেওয়া হয়েছে।

'গুপ্তধন হাওয়া ?' লালমোহনবাবু এই প্রথম গলা চড়িয়ে কথা বললেন।

ফেলুদার মুখের ভাব থমথমে। এটাকে অবিশ্যি নতুন কোনও রহস্য বলা চলে না। বোঝাই যাচ্ছে তড়িৎবাবুকে যে খুন করেছে সেই গুপ্তধন হাত করেছে। ফেলুদা তবুও গর্তের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর বলল, 'তোরা একটু জিরিয়ে নে। আমি আশপাশটা একটু সার্ভে করে নিচ্ছি।'

সত্যি বলতে কী, এতক্ষণ পা টিপে টিপে কাঁটা বাঁচিয়ে জঙ্গলে হেঁটে বেশ ক্লান্ত লাগছিল, তাই আমি আর লালমোহনবাবু বিশ্রামের একটা সুযোগ পেয়ে খুশিই হলাম। ফোকলা ফকিরের তলায় একটা শুকনো জায়গা বেছে আমরা মাটিতেই বসলাম, আর মাধবলাল গাছের গুঁড়িতে বন্দুকটাকে হেলান দিয়ে দাঁড় করিয়ে আমাদের সামনে বসে তার তেরো বছর বয়সে সে ভাল্লুকের আক্রমণ থেকে কীভাবে উদ্ধার পেয়েছিল সেই গল্প বলতে লাগল। আমার মন কিন্তু পুরোপুরি গল্পের দিকে যাচ্ছে না, কারণ একটা চোখ রয়েছে ফেলুদার দিকে। সে ঠোঁটের ফাঁকে একটা টাটকা ধরানো চারমিনার নিয়ে মন্দিরের চারপাশটা সার্ভে করছে। একবার মনে হল একটা সিগারেটের টুকরো তুলে নিয়ে আবার সেটাকে ফেলে দিল। আরেকবার হাঁটু গেড়ে বসে কোমরটাকে ভাঁজ করে প্রায় মাটিতে নাক ঠেকিয়ে কী যেন দেখল।

প্রায় দশ মিনিট ধরে তন্ন তন্ন করে চারিদিকে সার্ভে করে ফেলুদা মন্দিরের ভেতর ঢুকল। ধন্যি সাহস ফেলুদার। বাইরের থেকে মন্দিরের ভেতরটা অন্ধকূপের মতো মনে হয়। এককালে নাকি দশভুজার মূর্তি ছিল, কালাপাহাড়ের দৌলতে সে মূর্তির মাথা, চারটে হাত আর পেটের খানিকটা কাটা যায়। সেই থেকে মন্দিরের নাম হয়ে যায় পেটকাটি বা কাটা ঠাকুরানীর মন্দির। এখন ওর ভিতরে নির্ঘাত সাপ, তক্ষক আর গিরগিটির বাসা। তাও ফেলুদা নির্বিকারে মন্দিরের ভিতর ঢুকে সার্ভে করে মিনিটখানেক পরে বেরিয়ে এসে

রহস্যজনকভাবে বলল, 'তাজ্জব ব্যাপার। আলো পেতে হলে যে অন্ধকারে প্রবেশ করতে হয় তা এই প্রথম জানলাম।'

'কী মশাই, ডার্কনেস গন ?' বলে উঠলেন লালমোহনবাবু।

'খানিকটা,' বলল ফেলুদা, 'অমাবস্যার পর প্রতিপদের চাঁদ বলতে পারেন।'

'তা হলে তো ষোল কলা পুরতে এখনও অনেক দিন মশাই।'

'আপনি শুধু চাঁদের কথা ভাবছেন কেন ? সূর্য বলেও তো একটা জিনিস আছে। রাতটা কেটে গেলেই তো তার দেখা পাওয়ার কথা।'

'কালই, তার মানে, ক্লাইম্যাক্স বলছেন ?'

'আমি আর কিছুই বলছি না লালমোহনবাবু, শুধু বলছি যে এই প্রথম একটা আলোর আভাস দেখতে পাচ্ছি। চ তোপ্‌সে, বাড়ি চ।'

১০

আমরা বেরিয়েছিলাম দশটায়, ফিরতে ফিরতে হল প্রায় সাড়ে বারোটা। ফেলুদা তলোয়ারটা সোজা মহীতোষবাবুর হাতে তুলে দেবে বলে ঠিক করেছিল, কিন্তু এসে শুনলাম উনি আর শশাঙ্কবাবু বেরিয়ে গেছেন। বনবিভাগের বড় কর্তা নাকি এসে কালবুনি ফরেস্ট বাংলোতে রয়েছেন, সেখানেই গেছেন। কাজেই তলোয়ারটা এখন আমাদের ঘরে, আমাদেরই কাছে।

ঘরে আসার আগে অবিশ্যি আমরা একতলায় কিছুটা সময় কাটিয়ে এসেছি। ফেলুদার মাথায় কী যেন ঘুরছিল ; ও দোতলায় না গিয়ে সোজা চলে গেল ট্রোফি রুমে। সেই যেখানে জানোয়ারের ছাল আর মাথাগুলো রয়েছে, আর র‍্যাকে রাখা রয়েছে বন্দুকগুলো। ফেলুদা র‍্যাক থেকে একটা একটা করে বন্দুক নামিয়ে সেগুলো খুব মন দিয়ে দেখল। বন্দুকের নল, বন্দুকের বাঁট, বন্দুকের ট্রিগার, সেফটি ক্যাচ— প্রত্যেকটা জিনিস ও খুব মন দিয়ে পরীক্ষা করে দেখল। লালমোহনবাবু কী যেন একটা বলতে গিয়েছিলেন, কিন্তু ফেলুদা তাকে ধমকে থামিয়ে দিল।

'এখন কথা বলার সময় নয় লালমোহনবাবু, এখন চিন্তা করার সময়।'

লালমোহনবাবু এত দিনে ফেলুদার মতিগতি খুব ভালভাবেই জেনে গেছেন, তাই আর দ্বিতীয়বার মুখ খুললেন না।

দোতলায় উঠে বারান্দা দিয়ে আমাদের ঘরের দিকে যেতে ফেলুদা থমকে থেমে গেল। তার দৃষ্টি দেবতোষবাবুর ঘরের দিকে।

'সে কী, দাদার ঘরে তালা কেন ?'

সত্যিই তো ! ভদ্রলোক ঘর ছেড়ে গেলেন কোথায় ? আর তালা লাগিয়ে যাবারই বা কারণটা কী ?

ফেলুদা কী ভাবল জানি না। মুখে কিছুই বলল না। আমরা আমাদের ঘরে গিয়ে হাজির হলাম।

ফেলুদার এখনকার অবস্থাটা আমার খুব চেনা। জটিল রহস্যের জট ছাড়ানোর প্রথম অবস্থায় ওর ভাবটা এ রকমই হয়। দু মিনিট ভুরু কুঁচকে চুপ করে বসে থেকেই আবার উঠে দাঁড়াল, তারপর খানিকটা পায়চারি করে আবার হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে মাথা হেঁট করে চোখ বুজে ডান হাতের মাঝের আঙুলের ডগা দিয়ে কপালে আস্তে আস্তে টোকা মারা, তারপর আবার হাঁটা, আবার বসা— এই রকম আর কী। এইভাবেই একবার খাট ছেড়ে উঠে পায়চারি শুরু করে হঠাৎ থেমে গিয়ে বলল, 'কেউ যখন নেই, আর দেবতোষবাবুর ঘর যখন

বন্ধ, তখন এই ফাঁকে একটু চোরা অনুসন্ধান চালালে বোধহয় মন্দ হয় না।'

কথাটা বলে ফেলুদা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আমি দরজা দিয়ে গলা বাড়িয়ে দেখলাম, ও এদিক ওদিক দেখে মহীতোষবাবুর কাজের ঘরে ঢুকল।

বাঘের পায়ের ছাপ দেখে অবধি লালমোহনবাবুর সাহস অনেকটা বেড়ে গেছে। উনি এখন দিব্যি বাঘছালটার উপর চিত হয়ে শুয়ে বাঘের মাথাটা বালিশের মতো ব্যবহার করছেন। এইভাবে কিছুক্ষণ সিলিং-এর দিকে চেয়ে থেকে বললেন, 'কী শুভক্ষণেই বইটা মহীতোষবাবুকে উৎসর্গ করেছিলাম বলো তো। এমন একটা থ্রিলিং অভিজ্ঞতা কি না হলে হত? আজ সকালের কথাটাই চিন্তা করো— বাঁশের ভেতর বুলেট, ঘাসের মধ্যে সাপ, রয়েল বেঙ্গলের পায়ের ছাপ, পোড়ো মন্দির, গুপ্তধন, জরাগ্রস্ত অশ্বত্থ গাছ— আর কত চাই? এখন একবারটি ম্যান-ইটারের মুখোমুখি পড়তে পারলেই অভিজ্ঞতা কমপ্লিট।'

'শেষেরটা কি সত্যি করেই চাইছেন আপনি?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'আর ভয় নেই', একটা বিরাট হাই তুলে বললেন, লালমোহনবাবু, 'মাধবলাল শিকারি আর ফেলু মিত্তির শিকারি দু পাশে থাকলে মানুষখেকোর বাপের সাধ্যি নেই কিছু করে।'

লালমোহনবাবু প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, আর আমি মহীতোষবাবুর শিকারের বইটা পড়ছিলাম, এমন সময় ফেলুদা ফিরে এল।

'কিছু পেলেন?'

ফেলুদার পায়ের আওয়াজ পেয়েই লালমোহনবাবু সোজা হয়ে বসেছেন।

ফেলুদা গম্ভীর। বলল, 'যা খুঁজছিলাম তা পাইনি, আর সেটাই সিগনিফিক্যান্ট।'

তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে জানালার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে থেকে বলল, 'যুধিষ্ঠিরের রথের চাকা মাটিতে ঠেকল কেন জানেন তো লালমোহনবাবু?'

'সেই অশ্বত্থামা হত ইতি গজ-র ব্যাপার তো?

'হ্যাঁ। যুধিষ্ঠির পুরোপুরি সত্যি কথা বলেননি তাই। কিন্তু আজকের দিনে মিথ্যে বললেই যে চাকা মাটিতে ঠেকে যাবে এমন কোনও কথা নেই। এ যুগে মানুষের দোষের শাস্তি মানুষই দিতে পারে, ভগবান নয়।'

এর পরে একটা জিপের আওয়াজ পাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই চাকর এসে খবর দিল যে, ভাত বাড়া হয়েছে, বাবু এসেছেন, খেতে ডাকছেন।

মহীতোষবাবুর বাড়িতে খাওয়াটা ভালই হয়। সব সময় হয় কি না জানি না, কিন্তু আমরা যে ক'দিন রয়েছি সে ক'দিন রোজই মুরগি হয়েছে। কাল রাত্রে বিলিতি কায়দায় রোস্ট হয়েছিল, লালমোহনবাবু কাঁটা চামচ ম্যানেজ করতে পারছেন না দেখে মহীতোষবাবু বললেন যে পাখির মাংস হাত দিয়ে খেলে নাকি কেতায় কোনও ভুল হয় না। আজকেও খাওয়ার তোড়জোড় ভালই ছিল, কিন্তু প্রথম থেকেই কথাবার্তা এমন গুরুগম্ভীর মেজাজে শুরু হল যে, খাওয়ার দিকে বেশি নজর দেওয়া হল না। আমরা খাবার ঘরে ঢুকতেই মহীতোষবাবু বললেন, 'মিস্টার মিত্তির, সংকেতের ব্যাপারটা যখন চুকেই গেছে, তখন তো আর আপনাদের এখানে ধরে রাখার কোনও মানে হয় না। কাজেই আপনি যদি বলেন তা হলে আপনাদের ফেরার বন্দোবস্ত আমার লোক করে দিতে পারে। জলপাইগুড়িতে লোক যাচ্ছে, আপনাদের রিজার্ভেশনটা করে আনতে পারে।'

ফেলুদা কয়েক মুহূর্ত চুপ থেকে বলল, 'আমাদের দিক থেকেও আপনার আতিথেয়তার সুযোগ আর নেব না বলেই ভাবছিলাম। তবে আপনার যদি খুব বেশি আপত্তি না থাকে, তা হলে আজকের দিনটা থেকে কাল রওনা হতে পারি। বুঝতেই তো পারছেন, আমি গোয়েন্দা মানুষ, আমি থাকতে থাকতে একজন এভাবে খুন হলেন, তার একটা কিনারা না করে যেতে

পারলে মনটা খুঁতখুঁত করবে। আমিই করি, বা পুলিশই করুক, কীভাবে ঘটনাটা ঘটল সেটা জেনে যেতে পারলে ভাল হত।'

মহীতোষবাবু খাওয়া বন্ধ করে ফেলুদার দিকে সোজা তাকিয়ে গম্ভীর গলায় বললেন, 'সুস্থ মস্তিষ্কে খুন করতে পারে এমন লোক আমার বাড়িতে কেউ নেই, মিস্টার মিত্তির।'

ফেলুদা যেন কথাটা গায়েই করল না। বলল, 'আপনার দাদাকে কি অন্য কোথাও নিয়ে যাওয়া হয়েছে? ওঁর ঘরে তালা দেখছিলাম।'

মহীতোষবাবু সেইরকম গম্ভীরভাবেই বললেন, 'দাদা ঘরেই আছেন। তবে কাল রাত থেকে ওঁর একটু বাড়াবাড়ি যাচ্ছে। ওষুধ খাননি। তাই ওঁকে একটু সংযত করে রাখা দরকার। নইলে আপনাদেরও বিপদ আসতে পারে। আপনারাও তো দোতলাতেই থাকেন। উনি বাইরের লোককে এমনিতেই সন্দেহের চোখে দেখেন। শুধু তাই না, যে সব ঐতিহাসিক চরিত্র সম্পর্কে ওঁর মনে বিরূপ ভাব আছে, বাইরের লোককে সেইসব চরিত্র বা তাদের অনুচর বলে কল্পনা করেন। তড়িৎকে তো কালাপাহাড় ভেবে একদিন ওর টুঁটি টিপে ধরেছিলেন। শেষটায় মন্মথ গিয়ে কোনওমতে ছাড়ায়।'

ফেলুদা খাওয়া না থামিয়ে দিব্যি স্বাভাবিকভাবে বলল, 'তড়িৎবাবুর খুন হওয়াটাই কিন্তু একমাত্র ঘটনা নয়। আপনার গুপ্তধনও কে যেন সরিয়ে ফেলেছে। খুব সম্ভবত সেই একই রাত্রে।'

'সে কী!'—এবার মহীতোষবাবুর মুখের গ্রাস আর মুখ পর্যন্ত পৌঁছল না— 'গুপ্তধন নেই? আপনি দেখে এসেছেন?'

'হ্যাঁ। গুপ্তধন নেই, তবে তলোয়ারটা পাওয়া গেছে। আর তাতে রক্তের দাগও পাওয়া গেছে।'

মহীতোষবাবু বেশ কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে বসে রইলেন। এবার ফেলুদা তার তৃতীয় বোমাটা দাগল।

'তড়িৎবাবুকে যখন বাঘে খাচ্ছিল, তখন সেই বাঘের দিকে তাগ করে কেউ একটা গুলি ছোঁড়ে। সেটা বাঁশের গুঁড়িতে লাগে। গুলিটা সম্ভবত বাঘের গা ঘেঁষে গিয়েছিল, কারণ বাঘের কিছু লোম পাওয়া গেছে, মাটিতে পড়ে ছিল। কাজেই মনে হচ্ছে সে রাত্রে বেশ কয়েকজন লোক বিভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে জঙ্গলের একটা বিশেষ অংশে ঘোরাফেরা করছিল।'

'পোচার।'

কথাটা অপ্রত্যাশিতভাবে বলে উঠলেন শশাঙ্কবাবু। পোচার মানে যে চোরা শিকারি সেটা জানতাম। শিকারের বিরুদ্ধে আইন পাশ হবার পরেও এরা লুকিয়ে লুকিয়ে শিকার করে বাঘের চামড়া, হরিণের শিং, গণ্ডারের শিং, এই সব বিক্রি করে। এমনকী, বাঘভাল্লুকের বাচ্চা ধরেও মাঝে মাঝে বিক্রি করে।

শশাঙ্কবাবু বলে চললেন, 'তড়িৎকে যে-ই খুন করে থাকুক, তাকে বাঘে ধরে নিয়ে যাবার পর জঙ্গলে নিশ্চয়ই কোনও পোচার ঢোকে। পোচারই বাঘটাকে গুলি করেছিল, যে গুলি বাঘের গায়ে আঁচড় কেটে বাঁশের গুঁড়িতে লেগেছিল।'

ফেলুদা ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে বলল, 'সেটা অবিশ্যি অসম্ভব নয়। কাজেই বন্দুকের ব্যাপারটা নিয়ে আমাদের না ভাবলেও চলবে। কিন্তু অন্য দুটো রহস্য রয়েই যাচ্ছে।'

'দুটো নয়, একটা', বললেন মহীতোষবাবু। 'গুপ্তধন। ওটা পাওয়া দরকার। ওটা না পেলে সিংহরায় বংশের ইতিহাস অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। ওটা পেতেই হবে।'

'তা হলে এক কাজ করুন না কেন', ফেলুদা বলল, 'আমরা সবাই চলুন আরেকটিবার ওখানে যাই। জায়গাটা হল কাটা ঠাকুরানীর মন্দিরের পাশে।'

মহীতোষবাবু জঙ্গল অভিযানে আপত্তি করেননি। কিন্তু হলে কী হবে, বিকেল সাড়ে তিনটে থেকে চারিদিক অন্ধকার করে মুষলধারে বৃষ্টি নামল। সন্ধে ছ'টা পর্যন্ত যখন সে বৃষ্টি থামল না, তখন আমরা জঙ্গলে যাবার আশা ত্যাগ করলাম। ফেলুদা গম্ভীর থেকে এখন একেবারে গোমড়া হয়ে গেছে। মহীতোষবাবু যে আমরা চলে গেলে খুশি হন সেটা ওঁর কথায় পরিষ্কার বোঝা গেছে। কালও যদি আবহাওয়া খারাপ থাকে তা হলে হয়তো ফেলুদাকে তড়িৎবাবুর খুনের রহস্য সমাধান না করেই চলে যেতে হবে। অবিশ্যি আরেকবার কাটা ঠাকুরানীর মন্দিরে গেলেই যে ফেলুদার মনের অন্ধকার কীভাবে দূর হবে তা জানি না। তবে ও যে মনে মনে খানিকটা অগ্রসর হয়েছে সেটা ওর চোখ মাঝে মাঝে যেভাবে জ্বলে উঠছিল তা থেকেই বুঝতে পারছিলাম।

এর মধ্যে আমরা তিনজনেই একবার বাইরের বারান্দায় বেরিয়েছিলাম। তখন গ্র্যান্ডফাদার ক্লকে সাড়ে পাঁচটা বেজেছে। তখনও দেখলাম দেবতোষবাবুর ঘরের দরজা বন্ধ। লালমোহনবাবু ফিসফিস করে বললেন, 'একবার খড়খড়ি ফাঁক করে দেখে এলে হত না ভদ্রলোক কী করছেন! এ তল্লাটে তো কেউ নেই বলেই মনে হচ্ছে।'

ফেলুদা অবিশ্যি লালমোহনবাবুর অনেক কথার মতোই এটাতেও কান দিল না।

সাতটার সময় মেঘ কেটে গিয়ে আকাশে তারা দেখা দিল। মনে হচ্ছিল কুচকুচে কালো আকাশের গায়ে তারাগুলো এই মাত্র পালিশ করে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফেলুদা হাতে তলোয়ার নিয়ে খাটে বসে আছে। আমরা দুজনে সবে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছি, এমন সময় লালমোহনবাবু আমার শার্টের আস্তিনটা খামচে ধরে ফিসফিস গলায় বললেন, 'সরু টর্চ!'

দারোয়ানের বাড়িটা আমাদের জানালা থেকে দেখা যায়। আমাদের বাড়ি আর ওর বাড়ির মাঝামাঝি একটা গোলঞ্চ গাছ। তার নীচে একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। আর একটা টর্চওয়ালা লোক সেই লোকটার দিকে এগিয়ে গেল। এটা সেই ধরনের টর্চ যেগুলো বাড়ির প্লাগ পয়েন্টে গুঁজে দিলে চার্জ হয়ে থাকে। ছোট্ট বালব্, ছোট্ট কাচের মুখ, কিন্তু আলোর বেশ তেজ।

এবার ফেলুদা ঘরের বাতিটা নিবিয়ে দিয়ে আমাদের পাশে এসে দাঁড়াল।

'মাধবলাল', ফেলুদা ফিসফিস করে বলল।

যে লোকটা অপেক্ষা করছিল তাকে আমারও মাধবলাল বলে মনে হয়েছিল, কারণ এই অন্ধকারেও হলদে শার্টের রংটা আবছা আবছা বোঝা যাচ্ছিল। কিন্তু যে লোকটার হাতে টর্চ সে যে কে তা বোঝা ভারী মুশকিল। সে মহীতোষবাবুও হতে পারে, ওঁর দাদাও হতে পারে, শশাঙ্কবাবুও হতে পারে, আবার অন্য লোকও হতে পারে।

এখন টর্চের আলো নিবে গেছে। কিন্তু দুজনে দাঁড়িয়ে যে খুব নিচু গলায় কথা বলছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিছুক্ষণ পর হলদে শার্টটা নড়ে উঠল। তারপর টর্চের আলোটা জ্বলে উঠে আমাদের বাড়ির দিকে চলে এল। ফেলুদা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে ঘরের বাতিটা জ্বালিয়ে দিল।

লালমোহনবাবু বোধহয় নিজেই নিজের মনের মতো করে গোয়েন্দাগিরি চালিয়ে যাচ্ছেন, তাই তিনি হঠাৎ এক ফাঁকে বারান্দায় বেরিয়ে কী যেন দেখে এলেন।

'কী দেখলেন? দরজায় এখনও তালা?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ।' লালমোহনবাবু অপ্রস্তুত হাসি হেসে বললেন।

'আপনার কি ধারণা উনিই গিয়েছিলেন মাধবলালের সঙ্গে কথা বলতে?'

'আমি তো গোড়াতেই বলেছি মশাই, দাদাটিকে আমার ভাল লাগছে না। পাগল জিনিসটা

বড় ডেঞ্জারাস। আমাদের নর্থ ক্যালকাটায় এক পাগল ছিল, সে আপার সারকুলার রোডের ঠিক মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে ট্রাম আর বাস লক্ষ্য করে বেমক্কা ঢিল ছুঁড়ত। কী ডেঞ্জারাস বলুন তো!'

'দেবতোষবাবুর দরজা বন্ধতে কী প্রমাণ হল?'

'তার মানে ভদ্রলোক নীচে যাননি।'

'কী করে প্রমাণ হয় সেটা; ভদ্রলোক আদৌ ওই তালা-বন্ধ দরজার পিছনে আছেন কি না সেটা আপনি কী করে জানলেন? সারাদিনে তাঁর কোনও সাড়াশব্দ পেয়েছেন কি?'

লালমোহনবাবু যেন বেশ খানিকটা দমে গেলেন। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'মশাই, কত চেষ্টা করি, আমার চিন্তা ঠিক আপনার চিন্তার সঙ্গে এক লাইনে চালাব— কোথায় যেন গণ্ডগোল হয়ে যায়।'

'গণ্ডগোল না। কোলিশন। আপনি উলটো পথে চলেন কি না। আপনি আগে ক্রিমিনাল ঠিক করে নিয়ে তারপর তার ঘাড়ে ক্রাইমটা বসাতে চেষ্টা করেন, আর আমি ক্রাইমের ধাঁচটা বুঝে নিয়ে সেই অনুযায়ী ক্রিমিন্যাল খোঁজার চেষ্টা করি।'

'এই ব্যাপারেও তাই করছেন?'

'ও ছাড়া তো আর রাস্তা নেই লালমোহনবাবু।'

'কোনখান থেকে শুরু করেছেন?'

'কুরুক্ষেত্র।'

এর পরে আর লালমোহনবাবু কোনও প্রশ্ন করেননি।

আমাদের মশারি বদলে দেওয়াতে ঘুমটা ভালই হচ্ছিল, কিন্তু মাঝরাত্তিরে একটা চিৎকারে ঘুম ভেঙে ধড়মড় করে উঠে বসতে হল। চিৎকারটা করেছে ফেলুদা। জেগে দেখি, ও দাঁড়িয়ে আছে ঘরের মাঝখানে, হাতে রয়েছে আদিত্যনারায়ণের তলোয়ার। বাইরে থেকে চাঁদের আলো এসে ইস্পাতের ফলাটার উপর পড়াতে সেটা ঝিলিক মারছে। যে কথাটা শুনে ঘুমটা ভেঙেছিল সেটা ফেলুদা আরও দু বার বলল, তবে অত চেঁচিয়ে নয়। 'ইউরেকা! ইউরেকা!'

আর্কিমিডিস কী যেন একটা আবিষ্কার করে উল্লাসের সঙ্গে এই গ্রিক কথাটা বলে উঠেছিল। তার মানে হল 'পেয়েছি।' ফেলুদা যে কী পেয়েছে সেটা বোঝা গেল না।

১১

সকালে চা খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শশাঙ্কবাবু আমাদের ঘরে এলেন দেখে বেশ একটু অবাক লাগল। ফেলুদা ভদ্রলোককে বেশ খাতির-টাতির করে বসতে বলে বলল, 'আপনার সঙ্গে আর আলাপই হল না ঠিক করে। মহীতোষবাবুর বন্ধু হিসেবে আপনারও নিশ্চয়ই অনেক রকম অভিজ্ঞতা হয়েছে।'

শশাঙ্কবাবু টেবিলের সামনে চেয়ারটায় বসে বললেন, 'অভিজ্ঞতার শুরু কি সেই আজকে? মহীর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব পঞ্চাশ বছরের উপর। সেই ইস্কুল থেকে।'

'আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে পারি?'

'মহীতোষ সম্পর্কে?'

'না। তড়িৎবাবু সম্পর্কে।'

'বলুন।'

'আপনার মতে উনি কেমন লোক ছিলেন?'

'চমৎকার। অত্যন্ত বুদ্ধিমান, অত্যন্ত ধীর প্রকৃতির যুবক ছিল তড়িৎ।'

'আর কাজের দিক দিয়ে ?'

'অসাধারণ।'

'আমারও তাই ধারণা...'

এবার শশাঙ্কবাবু ফেলুদার দিকে সোজা দৃষ্টি দিয়ে বললেন, 'আমি আপনাকে একটা অনুরোধ করতে চাই।'

'বলুন।'

শশাঙ্কবাবুকে এই প্রথম সিগারেট খেতে দেখলাম। ফেলুদারই দেওয়া একটা চারমিনার ধরিয়ে একটা টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'এই তিন দিনে আপনার অনেক রকম অভিজ্ঞতা হল। আপনি নিজেও বুদ্ধিমান, তাই সাধারণ লোকের চেয়ে নিশ্চয়ই অনেক বেশি দেখেছেন, শুনেছেন, বুঝেছেন। আজ হয়তো আপনার এখানে শেষ দিন। আজ কী ঘটবে তা জানি না। যাই ঘটুক না কেন, এই বিশেষ জায়গার এই বিশেষ জমিদার পরিবারটি সম্বন্ধে আপনি যা জেনে গেলেন, সেটা যদি আপনি গোপন রাখতে পারেন, এবং আপনার এই বন্ধুটিকেও গোপন রাখতে বলেন, তা হলে আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ বোধ করব। আমি জানি মহীতোষও এটাই চাইবে। বাংলাদেশের প্রায় যে কোনও জমিদার বংশের ইতিহাস ঘাঁটলেই অনেক সব অদ্ভুত অপ্রিয় ঘটনা বেরিয়ে পড়বে সে তো আপনি জানেন। সে রকম সিংহরায় বংশের ইতিহাসেও অনেক অপ্রিয় তথ্য লুকিয়ে আছে সেটা বলাই বাহুল্য।'

ফেলুদা বলল, 'শশাঙ্কবাবু, আমি তিনদিন ধরে মহীতোষবাবুর আতিথেয়তা ভোগ করছি। সে কারণে আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। আমি কলকাতায় গিয়ে সিংহরায় পরিবার সম্পর্কে বদনাম রটাব, এটা কখনও হবে না। এ আমি কথা দিতে পারি।'

এর পর একটা প্রশ্ন ফেলুদা বোধহয় না করে পারল না।

'দেবতোষবাবুর ঘরের দরজা কাল থেকে বন্ধ দেখছি। এ ব্যাপারে আপনি কোনও আলোকপাত করতে পারেন কি ?'

শশাঙ্কবাবু একটা অদ্ভুত দৃষ্টিতে ফেলুদার দিকে চাইলেন। তারপর বললেন, 'আমার বিশ্বাস আজকের দিনটা ফুরোবার আগে আপনিই পারবেন।'

'পুলিশ কি তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে ?'

'উঁহু।'

'সে কী ! হঠাৎ বন্ধ করার কারণটা কী ?'

'যার উপর সন্দেহটা পড়ছে, মহীতোষ চায় না যে পুলিশ তাকে কোনওরকমভাবে বিব্রত করে।'

'আপনি দেবতোষবাবুর কথা বলছেন ?'

'আর কে আছে বলুন ?'

'কিন্তু দেবতোষবাবু যদি খুন করেও থাকেন, তিনি তো আর অভিযুক্ত হবেন না, কারণ তাঁর তো মাথা খারাপ।'

'তা হলেও ব্যাপারটা প্রচার হয়ে পড়বে তো ! মহীতোষ সেটাও চায় না।'

'সিংহরায় বংশের মর্যাদা রক্ষার জন্য ?'

'ধরুন যদি তাই হয়।'— বলে শশাঙ্কবাবু উঠে পড়লেন।

সাড়ে আটটার মধ্যে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। আজও প্রথম দিনের মতো দুটো জিপ। একটায় ফেলুদা, লালমোহনবাবু আর আমি, অন্যটায় মহীতোষবাবু, শশাঙ্কবাবু, মাধবলাল আর

মহীতোষবাবুর একজন বেয়ারা। আজ আমাদের সঙ্গে তিনটে বন্দুক। একটা নিয়েছে মাধবলাল, একটা মহীতোষবাবু, আর একটা— ফেলুদা! বন্দুক নেবার ইচ্ছেটা ফেলুদাই প্রকাশ করল। ফেলুদার রিভলভার চালানোর কথা মাধবলালই মহীতোষবাবুকে খুব ফলাও করে বলেছিল, তাই বন্দুক চাইতে মহীতোষবাবু আর আপত্তি করলেন না। বললেন, 'আপনার খুশিমতো একটা বেছে নিন। বাঘের জন্যই যদি হয় তো থ্রি-সেভেন-ফাইভটা নিতে পারেন।'

ওসব নম্বর-টম্বর আমি বুঝি না, তবে বেশ জবরদস্ত রাইফেল সেটা দেখে বুঝতে পারছি।

লালমোহনবাবুর মধ্যেও একটা চাপা উত্তেজনার ভাব, কারণ ফেলুদা তার হাতে আদিত্যনারায়ণের তলোয়ারটা ধরিয়ে দিয়েছে। দেবার সময় বলল, 'একদম হাতছাড়া করবেন না। আজকের নাটকে ওটার একটা বিশেষ ভূমিকা আছে।'

ভোরে যখন উঠেছিলাম তখন আকাশ মোটামুটি পরিষ্কার ছিল, কিন্তু এখন আবার মেঘ করে এসেছে। কালকের বৃষ্টির ফলে রাস্তায় কাদা হয়েছিল, তাই আমাদের পৌঁছতে খানিকটা বেশি সময় লাগল। কাটা ঠাকুরানীর মন্দির একেবারে জঙ্গলের ভিতরে, জিপ অত দূর যাবে না। কাল যেখানে নেমেছিলাম আজ সেখান থেকে আরও প্রায় আধ মাইল ভিতরে গিয়ে আমাদের জিপ থামল। মাধবলাল রাস্তা চেনে ; সে বলল, 'সামনে একটা নালা পেরিয়ে মিনিট পনেরো হাঁটলেই আমরা মন্দিরে পৌঁছে যাব।'

অল্প অল্প মেঘের গর্জন আর গাছের পাতা-কাঁপানো ঝিরঝিরে বাতাসের মধ্যে আমাদের অভিযান শুরু হল। গাড়ি থেকে নামবার আগেই ফেলুদা রাইফেলে টোটা ভরে নিয়েছে। মহীতোষবাবু নিজে তার বন্দুকটা নেননি ; ওটা রয়েছে বেয়ারা পর্বত সিং-এর হাতে। পর্বত সিং নাকি সব সময়ে মহীতোষবাবুর সঙ্গে শিকারে গেছে। বেঁটেখাটো গাট্টাগোট্টা চেহারা, দেখলেই বোঝা যায় গায়ে অসম্ভব জোর।

আজ খানিক দূর হাঁটার পরই দূরে একপাল হরিণ দেখে মনটা নেচে ওঠার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বুকটা ধড়াস করে উঠল। এই জঙ্গলের মধ্যেই কোথাও হয়তো সেই মানুষখেকো বাঘটা রয়েছে। এমনিতে বাঘ নাকি শিকারের খোঁজে রোজ অক্লেশে পঁচিশ-তিরিশ মাইল হেঁটে এ বন থেকে ও বন চলে যায়। কিন্তু এ বাঘ যদি জখমি বাঘ হয়ে থাকে, তা হলে হয়তো তার পক্ষে বেশি দূর হাঁটা সম্ভবই না। আর এমনিতেই জঙ্গল আর আগের মতো বড় আর ছড়ানো নেই। গত বিশ-পঁচিশ বছরে মাইলের পর মাইল গাছ কেটে ফেলে সেখান চাষের জমি হয়েছে, চা বাগান হয়েছে, লোকের বসতি হয়েছে। কাজেই বাঘ যে খুব দূরে চলে যাবে সে সম্ভাবনা কম। দিনের বেলা বাঘ সাধারণত বেরোয় না এটা ঠিক, কিন্তু মেঘলা দিনে নাকি বেরোন অসম্ভব না। এ ব্যাপারটা কালকেই ফেলুদা আমাকে বলেছে।

যে নালাটা আজ আমাদের পেরোতে হল সেটা কালকেও পেরিয়েছি। কাল প্রায় শুকনো ছিল, আজ কুলকুল করে জল বইছে। নালার ধারে বালি, তাতে জানোয়ারের পায়ের ছাপ। বাঘ নেই, তবে হরিণ, শুয়োর আর হায়েনার পায়ের ছাপ মাধবলাল চিনিয়ে দিল। আমরা নালা পেরিয়ে, ওপারের বনের মধ্যে ঢুকলাম। একটা কাঠঠোকরা মাঝে মাঝে ডেকে উঠছে, দূর থেকে একটা ময়ূরের ডাক শুনতে পাচ্ছি, আর কয়েকটা ঝিঁঝি ক্রমাগত ডেকে চলেছে। পায়ের সামনে ঘাসের উপর মাঝে মাঝে সড়াৎ সড়াৎ শব্দ পাচ্ছি, আর বুঝতে পারছি যে গিরগিটির দল মানুষের পায়ের তলায় পিষে যাবার ভয়ে এক ঝোপড়া থেকে আরেক ঝোপড়ার পিছনে গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে।

ক্রমে আমরা আমাদের চেনা জায়গায় পৌঁছে গেলাম। কাল এখানে এসেছিলাম অন্য পথ দিয়ে। এই যে সেই তলোয়ারের জায়গা। আমাদের দলপতি মাধবলাল অত্যন্ত

সাবধানে শব্দ না করে পা ফেলে এগিয়ে চলেছে, আর বাকি সকলে তার দেখাদেখি সেই ভাবেই চলার চেষ্টা করছি। মাটি এমনিতেই ভিজে নরম হয়ে আছে, শুকনো পাতা প্রায় নেই বললেই চলে, তাই সাতজন লোক একসঙ্গে হাঁটা সত্ত্বেও প্রায় কোনও শব্দই হচ্ছিল না।

সামনের গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে ইটের পাঁজা দেখা যাচ্ছে। কাটা ঠাকুরানীর ফাটা মন্দির।

একজনও একটা কথা না বলে একটুও শব্দ না করে মন্দিরের সামনে পৌঁছে গেলাম। সকলে থামল। সেদিন শুধু ফোকলা ফকিরের গাছ, অর্জুন গাছ আর জোড়া তাল গাছের দিকে লক্ষ ছিল বলে আশেপাশে যে আরও কতরকম গাছ আছে সেটা খেয়াল করিনি। সেই সব গাছের ফাঁক দিয়ে ঝিরঝির করে বাতাস আসছে, আর আসছে নালার কুলকুল শব্দ। মন্দিরের পিছন দিকেই নালা। ওই নালায় জল খেতে আসে জন্তু জানোয়ার। বাঘও আসে। মানুষখেকোও।

ফেলুদা অর্জুন আর জোড়া তালের মাঝখানে গর্তটার দিকে এগিয়ে গেল। মহীতোষবাবুও গেলেন পিছন পিছন। আজ গর্তে আরও বেশি জল। ফেলুদা সেদিকে আঙুল দেখিয়ে নিস্তব্ধতা ভেঙে দিয়ে প্রথম কথা বলল।

'এই গর্তে ছিল আদিত্যনারায়ণের গুপ্তধন।'

'কিন্তু,...সেটা গেল কোথায়?' চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলেন মহীতোষবাবু।

'কাছাকাছির মধ্যেই আছে, যদি না কালকের মধ্যে কেউ সেটা সরিয়ে থাকে।'

মহীতোষবাবুর চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে উঠল।

'আছে? আপনি সত্যি বলছেন আছে?'

'আপনি জানেন সে গুপ্তধন কী জিনিস?' ফেলুদা পালটা প্রশ্ন করল।

উত্তেজনায় মহীতোষবাবুর কপালের শিরা ফুলে উঠেছে, চোখমুখ লাল হয়ে গেছে। বললেন, 'না জানলেও অনুমান করতে পারি। আমার পূর্বপুরুষ যশোবন্ত সিংহরায় ছিলেন কোচবিহারের রাজা নরনারায়ণ ভূপের সেনাধ্যক্ষ। যশোবন্তের উপার্জিত টাকা—নরনারায়ণের নিজের টাঁকশালের টাকা— যার নাম ছিল নারায়ণী টাকা— সেই টাকা ছিল আমাদের বাড়িতে। এক হাজারের উপর রৌপ্যমুদ্রা, চারশো বছরের পুরনো। আদিত্যনারায়ণ যখন এ টাকা লুকিয়ে রাখেন, তখন তাঁর মাথা খারাপ হতে শুরু করেছে— ষাট বছর বয়সে ছেলেমানুষি দুষ্টু-বুদ্ধি খেলছে। তিনি মারা যাবার পর সে টাকা আর আর পাওয়া যায়নি। এতদিনে এই সংকেত তার সন্ধান দিয়েছে। ও টাকা আমার চাই মিস্টার মিত্তির, ওটা হারালে চলবে না।'

ফেলুদা মহীতোষবাবুর দিক থেকে ঘুরে মন্দিরের দিকে এগোচ্ছে। মন্দিরের কাছাকাছি পৌঁছে হঠাৎ আমার দিকে ফিরে বলল, 'তোপ্‌সে, বন্দুকটা ধর তো। মন্দিরের ভিতর রিভলভারই কাজ দেবে।'

আমার হাত কাঁপতে শুরু করেছে। কোনওরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে বন্দুকটা হাতে নিলাম। জিনিসটা যে এত অসম্ভব রকম ভারী সেটা দেখে বুঝতে পারিনি।

ফেলুদা মন্দিরের ভাঙা দরজা দিয়ে অন্ধকারের ভিতর ঢুকল। চৌকাঠ পেরোনোর সময় লক্ষ করলাম, ও পকেটে হাত ঢোকাল।

পাঁচ গোনার মধ্যেই পর পর দু বার রিভলভারের আওয়াজে আমার গায়ের লোম খাড়া হয়ে গেল। তারপর মন্দিরের ভিতর থেকে ফেলুদার কথা শোনা গেল।

'মহীতোষবাবু, আপনার লোকটিকে একবার পাঠান তো।'

পর্বত সিং বন্দুকটা তার মনিবের হাতে দিয়ে মন্দিরের ভিতরে ঢুকে এক মিনিটের মধ্যেই

একটা সর্বাঙ্গে কাদা-মাখা পিতলের ঘড়া নিয়ে বেরিয়ে এল, তার পিছনে ফেলুদা। মহীতোষবাবু পর্বত সিং-এর দিকে ছুটে গেলেন। ফেলুদা বলল, 'কেউটের যে রৌপ্যমুদ্রার প্রতি মোহ থাকতে পারে এটা ভাবিনি। কালই শিসের শব্দ পেয়েছিলাম, আজ দেখি ঘড়াটাকে সস্নেহে আলিঙ্গন করে পড়ে আছেন বাবাজি।'

মহীতোষবাবু হাত থেকে বন্দুক ফেলে দিয়ে সেই ঘড়াটার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে তার ভিতর থেকে সবে একমুঠো রুপোর টাকা বার করেছেন, এমন সময় একটা কাকর হরিণ ডেকে উঠল। আর তার ঠিক পরেই এক সঙ্গে অনেকগুলো বাঁদর আশপাশের গাছ থেকে চেঁচাতে আরম্ভ করল।

তারপরে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে এতগুলো ঘটনা একসঙ্গে ঘটে গেল যে ভাবতেও মন ধাঁধিয়ে যায়। প্রথমে মহীতোষবাবুর মধ্যে একটা আশ্চর্য পরিবর্তন দেখা গেল। এক মুহূর্ত আগে যিনি একসঙ্গে এতগুলো রুপোর টাকা দেখে আহ্লাদে আটখানা হয়ে গিয়েছিলেন, তিনি হাত থেকে সেই টাকা ফেলে দিয়ে ইলেকট্রিক শক্ খাওয়ার মতো করে চমকে উঠে দাঁড়িয়ে এক লাফে তিন হাত পিছিয়ে গেলেন। আমরা সবাই যে যেখানে আছি সেখানেই পাথরের মতো দাঁড়িয়ে পড়েছি। ফেলুদাই প্রথমে মুখ খুলল। কিন্তু তার গলার স্বর চাপা ফিসফিসে— 'তোপ্‌সে, গাছে ওঠ। লালমোহনবাবু, আপনিও।'

আমার পাশেই ফোকলা ফকিরের গাছ। ফেলুদার হাতে বন্দুকটা চালান করে দিয়ে ফোকলা ফোকরে পা দিয়ে উঠে হাত বাড়িয়ে একটা বড় ডাল ধরে দশ সেকেন্ডের মধ্যে আমি মাটি থেকে দশ হাত উপরে উঠে গেলাম। তার পরেই লালমোহনবাবু তার হাতের তলোয়ারটা আমার হাতে চালান দিয়ে একটা তাজ্জব ব্যাপার করলেন। অবিশ্যি উনি পরে বলেছিলেন যে ছেলেবেলায় আমতায় থাকতে নাকি অনেক গাছে চড়েছেন, কিন্তু চল্লিশ বছর বয়সেও যে তিনি এক নিমেষে আমার চেয়ে উপরের একটা ডালে উঠে পড়তে পারবেন এটা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।

বাকি ঘটনাগুলো আমি উপর থেকেই দেখেছিলাম। লালমোহনবাবু কিছুক্ষণ দেখে আর দেখতে পারেননি, কারণ তিনি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন ; তবে এমন আশ্চর্যভাবে তাঁর হাত-পা গাছের চওড়া ডালের দু দিকে ঝুলে ছিল যে তিনি মাটিতে পড়ে যাননি।

চারদিক থেকে বিশেষ বিশেষ জানোয়ার আর পাখির ডাক শুনেই বোঝা গিয়েছিল যে কাছাকাছির মধ্যে বাঘ এসে পড়েছে। অবিশ্যি বাঘ এদিকে আসার আর একটা কারণ ছিল সেটা পরে জেনেছিলাম। মোট কথা বাঘ আসছে বুঝেই ফেলুদা আমাদের গাছে চড়তে বলেছিল।

সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার করলেন মহীতোষবাবু। তার এই চেহারা যে কোনওদিন দেখব সেটা ভাবিনি। অবাক হয়ে দেখলাম ভদ্রলোক ফেলুদার দিকে ঘুরে দাঁতে দাঁত চেপে বলছেন, 'মিস্টার মিত্তির, আপনার যদি প্রাণের মায়া থাকে তো চলে যান।'

'কোথায় যাব মহীতোষবাবু?'

দুজনের হাতেই বন্দুক। মহীতোষবাবুরটা উপর দিকে উঠছে ফেলুদার দিকে।

'বলছি যান!' আবার বললেন মহীতোষবাবু। 'জিপ রয়েছে ওই দিকে। আপনি চলে যান। আমি আদেশ করছি, আপনি—'

মহীতোষবাবুর কথা শেষ হল না। একটা বাঘের গর্জনে সমস্ত বনটা কেঁপে উঠেছে। শুনলে মনে হবে না যে একটা বাঘ, মনে হবে পঞ্চাশটা হিংস্র জানোয়ার একসঙ্গে গর্জন করে উঠেছে।

এবার গাছের উপর থেকে দেখতে পেলাম— মন্দিরের পিছনে আরও কতগুলো অর্জুন

গাছের সাদা ডালের ফাঁক দিয়ে একটা গনগনে আগুনের মতো চলন্ত রং। সেটা লম্বা ঘাসের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে একটা প্রকাণ্ড ডোরাকাটা বাঘের চেহারা নিল। বাঘটা এগিয়ে আসছে কাটা ঠাকুরানীর ডান পাশ দিয়ে, আমাদের এই খোলা জায়গাটার দিকে।

মহীতোষবাবুর হাতের বন্দুকটা নীচে নেমে এসেছে। একে ভারী বন্দুক তার উপর ওঁর হাত থর থর করে কাঁপছে।

এদিকে ফেলুদার বন্দুকের নলটা উপর দিকে উঠছে। আরও তিনজন লোক আছে আমাদের সঙ্গে— শশাঙ্কবাবু, মাধবলাল আর পর্বত সিং। পর্বত সিং এইমাত্র একটা প্রকাণ্ড লাফ দিয়ে পালাল। অন্য দুজন কী করছে জানি না, কারণ আমার চোখ একবার বাঘ আর একবার ফেলুদার দিকে যাচ্ছে।

এখন বাঘটা মন্দিরের পাশে এসে পড়েছে।

বাঘের মুখটা ফাঁক হল। তার দাঁতগুলো দেখা যাচ্ছে। এতগুলো শিকার এক সঙ্গে চোখের সামনে সে নিশ্চয়ই দেখেনি কখনও।

বাঘটা থেমে গেছে। তার শরীরটা একটু নিচু হল। একটা লাফ মারার আগের অবস্থা, যাকে ওত পাতা বলে। এইভাবে লাফ দিয়ে প'ড়ে বাঘ একটা মোষকেও—

দুম! দুম!

প্রায় একই সঙ্গে দুটো বন্দুক গর্জিয়ে উঠল। আমার কান ঝালাপালা। দৃষ্টিটাও যেন এক মুহূর্তের জন্য ঝাপসা হয়ে গেল। তারই মধ্যে দেখলাম বাঘটা লাফ দিয়ে শূন্যপথে একটা অদৃশ্য বাধার সামনে পড়ে উলটোদিকে একটা ডিগবাজি খেয়ে একেবারে গুপ্তধনের কলসিটার ঠিক পাশে আছড়ে পড়ল, তার ল্যাজের ঝাপটায় কলসিটা প্রচণ্ড খটাং শব্দে ছিটকে গড়িয়ে গিয়ে তার থেকে চারশো বছরের পুরনো নারায়ণী টাকা ছড়িয়ে পড়ল।

ফেলুদা বন্দুকটা নামিয়ে নিয়েছে। মাধবলাল বলল, 'উয়ো মর গিয়া।'

'কার গুলিতে মরল বলুন তো?'

প্রশ্নটা করল ফেলুদা। মহীতোষবাবুর উত্তর দেবার ক্ষমতা নেই। তিনি মাথা হেঁট করে মাথায় হাত দিয়ে মাটিতে বসে আছেন। তার হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া বন্দুকটা এখন শশাঙ্কবাবুর হাতে।

শশাঙ্কবাবু বাঘটার দিকে এগিয়ে গেলেন। তারপর বললেন, 'এসে দেখুন মিস্টার মিত্তির। একটা গুলি গেছে চোয়ালের তলা দিয়ে একেবারে মাথার খুলি ভেদ করে; আরেকটা গেছে কানের পাশ দিয়ে। দুটোর যে কোনওটাতেই বাঘটা মরে থাকতে পারে।'

১২

জোড়া বন্দুকের গুলির আওয়াজে উত্তরদিকের গ্রাম থেকে লোকজন ছুটে এসেছে। তারা মহা ফুর্তিতে বাঘটাকে মন্দিরের ও পাশে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে, বাঁশের সঙ্গে বেঁধে কাঁধে তোলার আয়োজন করছে। এটাই যে মানুষখেকো তাতে কোনও সন্দেহ নেই। আরও দুটো গুলির চিহ্ন বাঘের গায়ে পাওয়া গেছে; একটা পিছনের পায়ে, আর একটা চোয়ালের কাছে। এর যে কোনও একটার ফলে বাঘ তার স্বাভাবিক শিকারের ক্ষমতা হারিয়ে মানুষের পিছনে ধাওয়া করতে পারে। বাঘটার বয়সও যে বেশি সেটা তার গালের দু পাশের ঘন লোম থেকেই বোঝা যায়।

পর্বত সিং ফিরে এসেছে। সে মহীতোষবাবুর হাত ধরে তুলে তাঁকে মন্দিরের ভাঙা সিঁড়ির উপর বসিয়ে দিয়েছে। ভদ্রলোক এখনও ঘন ঘন ঘাম মুছছেন। লালমোহনবাবুর জ্ঞান ফিরেছে। গাছ থেকে নামাটা তাঁর পক্ষে ওঠার মতো সহজ হয়নি, আমার সাহায্য নিতে হয়েছে। নেমে এসেই, যেন কিচ্ছু হয়নি এমন ভাব করে আমার হাত থেকে তলোয়ারটা আবার নিয়ে নিয়েছেন।

কিছুক্ষণ চুপচাপের পর ফেলুদা কথা বলল।

'মহীতোষবাবু, আপনি বৃথাই দুশ্চিন্তায় ভুগছেন। আমি আপনার শিকারের অক্ষমতা কারুর কাছে প্রকাশ করব না সেটা আমি শশাঙ্কবাবুকে কথা দিয়েছি। আমি ব্যাপারটা অনেক আগে থেকেই সন্দেহ করেছি। লালমোহনবাবুর চিঠিতে আপনার সই দেখে আমি ভেবেছিলাম আপনি বুঝি বৃদ্ধ। লিখতে গেলে যদি আপনার হাত কাঁপে, তা হলে বন্দুক ধরলে সে হাত স্থির থাকবে কী করে সে চিন্তা আমাকে ভাবিয়ে তুলেছিল। অবিশ্যি এমনও হতে পারে যে, আপনার হাত খুব সম্প্রতি বিকল হয়েছে; বইয়ে যে সব শিকারের কথা

লিখেছেন সে-সব আপনিই করেছেন। কিন্তু আমার মনে নতুন করে সন্দেহ ঢুকিয়ে দিলেন আপনার দাদা। দেবতোষবাবু অসংলগ্ন কথা বললেও তাঁর একটা কথার সঙ্গে আর একটা কথার সরাসরি সম্পর্ক না থাকলেও, তিনি যে আজগুবি মিথ্যে বলছেন এটা কিন্তু আমার কখনও মনে হয়নি। তিনি যা বলছেন তার মধ্যে খুঁজলে অর্থ পাওয়া যায়, এটাই আমার মনে হয়েছিল। আপনি শিকারের বই লিখছেন সেটা নিশ্চয়ই উনি জানতেন, আর আপনি যে এত বড় একটা মিথ্যের আশ্রয় নিয়েছেন তাতে তিনি নিশ্চয় খুবই কষ্ট পেয়েছিলেন। এই মিথ্যে নিয়ে আক্ষেপ আমি দুবার তাঁর মুখে শুনেছি। সবার হাতে হাতিয়ার বাগ মানে না এটাও তিনি—'

ফেলুদার কথা বন্ধ করে মহীতোষবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন—

'বাগ মেনেছিল। সাত বছর বয়সে আমি এয়ারগান দিয়ে শালিক মেরেছি, চড়ুই মেরেছি— পঞ্চাশ গজ দূর থেকে। কিন্তু...'

মহীতোষবাবুর দৃষ্টি বুড়ো অশ্বত্থ গাছটার দিকে চলে গেল। তারপর বললেন, 'একদিন চড়ুইভাতি করতে এসে ওই গাছে চড়েছিলাম— ওই ডালে— যেখানে আপনার ভাইটি উঠেছিল। দাদা বলল বাঘ আসছে, আর আমি বাঘ দেখব বলে লাফ মেরে—'

'হাত ভাঙলেন?'

'কম্পাউন্ড ফ্র্যাকচার', এগিয়ে এসে বললেন মহীতোষবাবুর বন্ধু শশাঙ্ক সান্যাল। 'কোনও দিনই হাড় জোড়া লাগেনি ভাল করে।'

ফেলুদা বলল, 'কিন্তু বংশের মর্যাদা রক্ষা করার জন্য শিকারি হবার শখ হল? আর নিজের দেশের নিজের জঙ্গলে মিথ্যে ধরা পড়ে যাবে বলে উড়িষ্যা আর অসমের জঙ্গলে শিকার করলেন? আপনি করলেন মানে, করলেন শশাঙ্কবাবু, কিন্তু লোকে বুঝল যে সিংহরায় পরিবারে তিন পুরুষ ধরে বাঘ শিকারের ধারা চলে আসছে। তাই না মহীতোষবাবু?'

মহীতোষবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'শশাঙ্ক যা করেছে তার বন্ধুর জন্য, তেমন আর কেউ করে না। ওর মতো শিকারি আমাদের পরিবারেও কেউ জন্মায়নি।'

'কিন্তু সম্প্রতি সেই বন্ধুত্বে কি একটু চিড় ধরেছিল?'

মহীতোষবাবু আর শশাঙ্কবাবু দুজনেই চুপ করে আছেন দেখে ফেলুদা বলে চলল, 'বই বেরোবার আগে আমি অন্তত মহীতোষ সিংহরায়ের নাম শুনিনি। কিন্তু বেরোবার পরে আজ হাজার হাজার লোকে তাঁর নাম শুনেছে, এবং একটা বিরাট মিথ্যেকে সত্যি বলে মেনে নিচ্ছে। আসল শিকারি কিন্তু তাঁর ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। সেটা কি তিনি খুব সহজেই মেনে নিতে পারছেন? বন্ধুত্বের খাতিরে কতটা আত্মত্যাগ সম্ভব? আপনি সেদিন রাত্রে শশাঙ্কবাবুকেই কথা শোনাচ্ছিলেন না? আমি কি অনুমান করতে পারি যে, বেশ কিছুদিন থেকেই শশাঙ্কবাবু আর আপনার মধ্যে একটা মনোমালিন্য ও কথা কাটাকাটি চলছে?'

এখনও দুজনে চুপ। ফেলুদা স্থির দৃষ্টিতে মহীতোষবাবুর দিকে চেয়ে থেকে বলল, 'মৌনং সম্মতি লক্ষণম্ বলেই ধরে নিচ্ছি। আর, আরেকটা ব্যাপারেও আপনার বোধহয় মৌন অবলম্বন ছাড়া রাস্তা নেই।'

মহীতোষবাবু ভয়ে ভয়ে ফেলুদার দিকে চাইলেন। ফেলুদা বলল, 'তড়িৎবাবুর সাহিত্যকীর্তির জন্যই যে আপনি প্রশংসা পাচ্ছেন, সেটাও বোধহয় সত্যি। তাই নয়, মহীতোষবাবু? আপনি সেদিন আপনার পাণ্ডুলিপির কথা বললেন, কিন্তু আমি তন্ন তন্ন করে খুঁজেও আপনার লেখা একটি টুকরো কাগজও কোথাও পেলাম না। আসলে আপনি লিখতেন না, আপনি মুখে মুখে আপনার মতো করে বলতেন, আর তড়িৎবাবু সেটাকে তাঁর

আশ্চর্য সাবলীল ভাষায় সাজিয়ে দিতেন আর সেই সাজানো লেখা প্রকাশিত হত আপনার নামে। তড়িৎবাবুকে আপনি ভাল মাইনে দিতেন, তাকে আরামে রেখেছিলেন, তোয়াজে রেখেছিলেন এ সবই ঠিক। কিন্তু একজন সত্যিকারের গুণী স্রষ্টার পক্ষে ওগুলো যথেষ্ট নয় মহীতোষবাবু। সে সবচেয়ে বেশি যেটা আশা করে সেটা হল তার গুণের আদর— যেটা না পেয়ে তড়িৎবাবুর মন ক্রমে ভেঙে যায়। তারপর সংকেতটা হাতে পড়ে, আর তার সমাধানও হয়ে যায়। নারায়ণী মুদ্রার কথাটা হয়তো তিনি আপনার পারিবারিক কাগজের মধ্যে পেয়েছিলেন। মোট কথা তিনি স্থির করেন যে, গুপ্তধন নিয়ে আপনার কাজে ইস্তফা দিয়ে চলে যাবেন। কিন্তু সে আশা তাঁর পূর্ণ হল না।'

মহীতোষবাবু যেন বেশ কষ্ট করেই উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'সবই তো বুঝলাম মিস্টার মিত্তির, এর সবই ঠিক এবং কোনওটাই আমার শুনতে ভাল লাগছে না। কিন্তু তড়িৎকে এভাবে হত্যা করল কে? তার না হয় আমার উপর আক্রোশ ছিল, কিন্তু তার উপর কারও আক্রোশ ছিল বলে তো আমি জানি না। তড়িৎ ছাড়া আর কে এসেছিল সেদিন জঙ্গলে?'

'কে এসেছিল তা বোধহয় আমি বলতে পারি।'

মহীতোষবাবু পায়চারি আরম্ভ করেছিলেন, ফেলুদার কথা শুনে থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন।

'পারেন?'

ফেলুদার দৃষ্টি ঘুরে গেল।

'শশাঙ্কবাবু, আপনি সেদিন রাত্রে ট্রোফি রুম থেকে একটি উইনচেস্টার রাইফেল নিয়ে এই জঙ্গলে আসেননি? কাল রাত্রে ওটার বাঁটে সামান্য একটু মাটি লেগে রয়েছে দেখলাম, যেটা পরশু রাত্রে দেখিনি।'

শশাঙ্কবাবুর নার্ভ বোধহয় বাঘ শিকার করেই আশ্চর্যরকম শক্ত হয়ে গিয়েছিল। উনি অদ্ভুত ঠাণ্ডাভাবে ফেলুদার দিকে চেয়ে বললেন, 'যদি এসেই থাকি— আপনি তার কী মানে করতে চাইছেন সেটা বলবেন কি?'

ফেলুদাও ঠিক শশাঙ্কবাবুর মতোই শান্তভাবে বলল, 'বন্ধু সম্পর্কে আপনার হতাশা জাগলেও আপনি তার গুপ্তধনের ওপর লোভ করবেন সেটা আমি মোটেই ভাবছি না। তবে আমার ধারণা, তড়িৎবাবু যে সংকেতের সমাধান করে ফেলেছেন সেটা আপনি জানতেন, তাই না?'

শশাঙ্কবাবু বললেন, 'শুধু তাই না, তড়িৎ গুপ্তধন পেলে তার অর্ধেক আমাকে অফার করেছিল। তড়িৎ বুঝেছিল মহীতোষ আমাদের দুজনকেই একইভাবে বঞ্চিত করছে। কিন্তু আমি তড়িতের প্রস্তাবে রাজি হইনি। শুধু তাই নয়, আমি গুপ্তধনের সন্ধানে এখানে আসতে অনেক বার বারণ করেছিলাম। কারণ ওই ম্যান-ইটার। শেষটায় সেদিন রাত্রে জানালা দিয়ে ওর টর্চের আলো দেখে আমি বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। এখানে এসে দেখি গুপ্তধন পড়ে আছে, কিন্তু তড়িৎ নেই। তারপর অনুসন্ধান করে দেখলাম রক্তের দাগ, বাঘের পায়ের ছাপ। গুপ্তধন মন্দিরের ভিতর রেখে, সেই চিহ্ন ধরে আমি এগিয়ে যাই বাঁশবনের কাছাকাছি পর্যন্ত। বিদ্যুতের আলোতে দেখি বাঘ তড়িতের মৃতদেহের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। অন্ধকারে আন্দাজেই গুলি চালাই। বাঘ পালায়। তারপর...'

শশাঙ্কবাবু কেন যেন চুপ করে গেলেন। ফেলুদা বলল, 'বাকিটা আমি বলি? এটাও অনুমান। ভুল হলে আমাকে শুধরে দেবেন।'

'বেশ। বলুন।'

'আপনিই কাল রাত্রে মাধবলালের সঙ্গে কথা বলছিলেন না?'

শশাঙ্কবাবু অস্বীকার করলেন না। ফেলুদা এবার আর একটা প্রশ্ন করল।

'সেটা কি মন্দিরের পিছনে বাঘের জন্য টোপ ফেলার প্রস্তাব দিতে ? ওই শিমুল গাছটার মগডালে শকুনির পাল দেখে মনে হচ্ছে ওর কাছাকাছি একটা মরা জানোয়ার পড়ে আছে।'

'মোষের বাচ্চা', চাপা গলায় বললেন শশাঙ্কবাবু।

'তার মানে আপনি চাইছিলেন যে আজ বাঘ বেরোক, যাতে আপনি অন্তত একজন বাইরের লোকের সামনে প্রমাণ করে দিতে পারেন যে শিকারি আসলে হচ্ছেন আপনি, মহীতোষবাবু নন।'

মহীতোষবাবু হঠাৎ ফেলুদার দিকে এগিয়ে এসে কাঁধে হাত দিয়ে অনুনয়ের সুরে বললেন, 'মিস্টার মিত্তির, আমি আপনাকে একটা অনুরোধ করব, আপনাকে সেটা রাখতে হবে।'

'কী অনুরোধ ?'

'এই গুপ্তধনের কিছু অংশ আমি আপনাকে দিতে চাই। সেটা আপনাকে নিতে হবে।'

ফেলুদা মহীতোষবাবুর চোখে চোখ রেখে মৃদু হেসে বলল, 'রৌপ্যমুদ্রা আমি চাই না মিস্টার সিংহরায়। কিন্তু একটা জিনিস আমি নেব।'

'কী জিনিস ?'

'আদিত্যনারায়ণের তলোয়ার।'

লালমোহনবাবু কথাটা শোনা মাত্র এগিয়ে এসে ফেলুদার হাতে তলোয়ারটা দিয়ে দিল।

'এই তলোয়ারটা আপনি চাইছেন ?' মহীতোষবাবু অবাক হয়ে বললেন। 'নারায়ণী রৌপ্যমুদ্রা না নিয়ে ইস্পাতের তলোয়ার নেবেন ?'

'এ তলোয়ারকে আর সাধারণ তলোয়ার বলা চলে না মহীতোষবাবু। এর সঙ্গে ইতিহাস ছাড়াও আরও কিছু জড়িত হয়ে পড়েছে।'

'আপনি তড়িতের খুনের কথা বলছেন ?'

'না।'

'তবে ?'

'খুনের কথা বলছি না, কারণ তড়িৎবাবু খুন হননি।'

'তবে ? আত্মহত্যা ?'

'তাও না।'

'আপনি কি হেঁয়ালি তৈরি করছেন মিস্টার মিত্তির ?' মহীতোষবাবুর গলার স্বরে বুঝলাম, তার ভিতরের কঠিন মানুষটা আবার বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

ফেলুদা বলল, 'না, তা করছি না, মহীতোষবাবু। যা ঘটেছিল সেটাই বলতে যাচ্ছি। সেটা এত স্পষ্ট বলেই আমাদের দৃষ্টি সেদিকে যাচ্ছিল না। তলোয়ারটা তড়িৎবাবু নিজেই আদিত্যনারায়ণের ঘর থেকে সরিয়েছিলেন।'

'সে কী, কেন ?'

'কারণ গুপ্তধন পেতে হলে তাকে মাটি খুঁড়তে হবে, আর তার জন্য শাবল জাতীয় একটা কিছুর দরকার। তড়িৎবাবুর হাতের সবচেয়ে কাছে ছিল এই তলোয়ারটা।'

'তারপর ?'

'তারপর কী— সেটা বলার আগে এই তলোয়ারের একটা বিশেষত্ব আমি আপনাদের দেখাতে চাই।'

এই বলে ফেলুদা তলোয়ারটা নিয়ে কেন যেন শশাঙ্কবাবুর দিকে এগিয়ে গেল। শশাঙ্কবাবু সাহসী হলেও ফেলুদাকে ওইভাবে অস্ত্র হাতে নিয়ে এগিয়ে আসতে দেখে একটু যেন উসখুস করে উঠলেন। এবার ফেলুদা এক আশ্চর্য খেল দেখাল। সে তলোয়ারটা শশাঙ্কবাবুর হাতের বন্দুকের নলের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে নিয়ে গেল, আর খুব কাছাকাছি আসতেই

একটা খটাং শব্দ করে ইস্পাতে ইস্পাতে জোড়া লেগে গেল।

'এ কী, এ যে চুম্বক!' বলে উঠলেন শশাঙ্কবাবু।

'হ্যাঁ, চুম্বক', বলল ফেলুদা। 'তলোয়ারটাই চুম্বক, বন্দুকটা না। আগে চুম্বক ছিল না, কারণ আদিত্যনারায়ণের আলমারিতে তলোয়ারের পাশেই আরও ছোটখাটো অনেক লোহা আর ইস্পাতের জিনিস ছিল। চুম্বক হলে তলোয়ার বার করা বা রাখার সময় সেগুলো এর গায়ে আটকে যেত নিশ্চয়ই, কিন্তু যায়নি। এ তলোয়ার চুম্বকে পরিণত হয়েছে পরশু রাত্রে।'

'কী করে?' জিজ্ঞেস করলেন মহীতোষবাবু। সকলেই রুদ্ধশ্বাসে ফেলুদার কথা শুনছে।

ফেলুদা বলল, 'কোনও মানুষের হাতে লোহা বা ইস্পাতের কোনও জিনিস থাকা অবস্থায় যদি তার উপর বাজ পড়ে, তা হলে সে জিনিস চুম্বকে পরিণত হয়। শুধু তাই নয়, সে জিনিস অনেক সময় বিদ্যুৎকে আকর্ষণ করে। তড়িৎবাবুর মৃত্যু হয়েছিল বজ্রাঘাতে, এবং হয়তো এই তলোয়ারই তার মৃত্যুর জন্য দায়ী। মাটি খুঁজে কলসি বার করার পর বৃষ্টি নামে, তার সঙ্গে বাজ ও বিদ্যুৎ। তড়িৎবাবু অশ্বত্থগাছের নীচে আশ্রয়ের জন্য ছুটে আসেন। বাজ পড়ে। তড়িৎবাবু ছিটকে পড়ার সময় তার হাতের তলোয়ার বুকে বিঁধে যায়। সম্ভবত মৃত্যুর পরমুহূর্তেই তলোয়ার তার দেহে প্রবেশ করে।'

মহীতোষবাবুর সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপছে। তাঁর দৃষ্টি অশ্বত্থ গাছটার দিকে গেল। ভাঙা ভাঙা অস্ফুট স্বরে বললেন, 'তাই ভাবছিলাম, এই গাছটা হঠাৎ এত বুড়ো হয়ে গেল কী করে!'

মহীতোষবাবুর কথার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই লালমোহনবাবু বলে উঠলেন, 'তড়িৎবাবু শেষটায় তড়িৎপৃষ্ট হয়ে মারা গেলেন!'

দুঃখের বিষয় ওঁর এই চমৎকার কথাটায় কান দেবার মতো মনের অবস্থা তখন কারুরই ছিল না।

* * *

আমরা আজ কলকাতা ফিরে যাচ্ছি। আজ বাইরে রোদ, দু দিন বৃষ্টি হওয়ার দরুন গরমও কম। আমরা জিনিসপত্র গুছিয়ে ঘরে বসে আছি, মাঝে মাঝে বাইরে থেকে দেবতোষবাবুর গলা পাচ্ছি। সকালে উঠেই দেখেছি ওঁর ঘরের দরজায় আর তালা নেই। গাছ থেকে নামার সময় লালমোহনবাবুর হাঁটু ছড়ে গিয়েছিল। ক্ষতের উপর উনি স্টিকিং প্লাস্টার লাগাচ্ছেন, এমন সময় মহীতোষবাবুর চাকর একটা স্টিলের ট্রাঙ্ক মাথায় করে ঘরে ঢুকে সেটাকে মাটিতে নামিয়ে রেখে বলল, মহীতোষবাবু পাঠিয়ে দিয়েছেন। ফেলুদা সেটা খুলতেই দেখা গেল তার মধ্যে খুব সাবধানে প্যাক করা রয়েছে একটা চমৎকার বাঘছাল। একটা খামও ছিল ট্রাঙ্কটার মধ্যে, তার ভিতরে তিন লাইনের একটা চিঠি—

'ডিয়ার মিস্টার মিত্তির, আমার কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ এই বাঘছালটি গ্রহণ করিয়া আমাকে বাধিত করিবেন। ১৯৫৭ সালে সম্বলপুরের নিকটবর্তী এক জঙ্গলে আমার বন্ধু শ্রীশশাঙ্কমোহন সান্যাল কর্তৃক এই বাঘটি নিহত হইয়াছিল।'

লালমোহনবাবু চিঠিটা পড়ে বললেন, 'দুজনের গুলিতে যেটা মরল, সেটা কি দু ভাগে ভাগ করা হবে?'

ফেলুদা বলল, 'না। ওটা শশাঙ্কবাবু আমাকেই দেবেন বলেছেন।'

'ও, তার মানে আপনি একাই...'

'না, একা না। দুটোর একটা আপনাকে উপহার দেব বলে স্থির করেছি।'

'উপহার ?'

'উপহার। গাছের ডালে উঠে অজ্ঞান হয়েও যে মাটিতে না পড়ে ঝুলে থাকা যায়, সেইটে সর্বপ্রথম আপনিই প্রমাণ করেছেন।'

লালমোহনবাবু হাঁ হাঁ করে উঠলেন।

'আরে মশাই, আমি তো বলেইছি আমার কল্পনাশক্তিটা সাধারণ লোকের চেয়ে একটু বেশি। আপনারা বলছেন বাঘ, আর আমি দেখছি একটা লেলিহান অগ্নিশিখা, আর তার মধ্যে একটা পৈশাচিক দানব দাঁত খিঁচুচ্ছে, আর সেই সঙ্গে কর্ণপটাহ বিদীর্ণ করা এক হুঙ্কার ছেড়ে একটা জেট প্লেন টেক অফ্ করছে আমারই উপর ল্যান্ড করবে বলে। এতেও যদি সংজ্ঞা না হারাই তো সংজ্ঞা জিনিসটা রয়েছে কী করতে ?'

জয় বাবা ফেলুনাথ

১

রহস্য রোমাঞ্চ ঔপন্যাসিক লালমোহন গাঙ্গুলী ওরফে জটায়ু প্লেট থেকে একটা চীনাবাদাম তুলে নিয়ে ডান হাতের বুড়ো আঙুল আর তার পাশের আঙুল দিয়ে সেটার উপর একটা হালকা হুঁশিয়ার চাপ দিতেই ব্রাউন খোলসের মধ্যে থেকে মসৃণ ফরসা বাদামটা সুড়ুৎ করে বেরিয়ে তাঁর বাঁ হাতের তেলোর উপর পড়ল। সেটা মুখে পুরে খোসাটা সামনের টেবিলে রাখা অ্যাশ-ট্রেতে ফেলে দিয়ে হাত ঝেড়ে ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন, 'দশাশ্বমেধ ঘাটে বিজয়া দশমী দেখেছেন কখনও ?'

ফেলুদার সামনে দাবার বোর্ড, তার উপরে একটা সাদা রাজা, একটা সাদা গজ আর একটা সাদা বোড়ে, আর একটা কালো রাজা আর দুটো কালো ঘোড়া। বোর্ডের পাশে গ্রেট গেম্‌স অফ চেস বলে একটা বই খোলা ; ফেলুদা তার মধ্যে থেকে একটা চ্যাম্পিয়নশিপ গেম বেছে নিয়ে তার চালগুলো বই দেখে দেখে চালছিল। খেলার প্রায় মাঝামাঝি লালমোহনবাবু এসে পড়েন। আজকাল আর ওঁর সঙ্গে বাড়াবাড়ি রকম ভদ্রতা না করলেও চলে, তাই ফেলুদা শ্রীনাথকে চা আনতে বলে খেলাটা শেষ করে নিচ্ছিল, আর চালের ফাঁকে ফাঁকে লালমোহনবাবুর প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিল। এ-প্রশ্নটার জবাবেও সে বই থেকে চোখ না তুলেই বলল, 'উঁহু।'

'ওঃ—সে যা ব্যাপার না। সে এক, যাকে বলে, জমজমাট ব্যাপার। সে মশাই আপনি না দেখলে ইয়েই করতে পারবেন না।'

ফেলুদা খেলার শেষ চালটা চেলে বোর্ডের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, 'আপনি কি আমায় লোভ দেখাবার চেষ্টা করছেন ?'

'তা কতকটা ঠিকই ধরেছেন, হেঃ হেঃ !'

'কিন্তু আপনি যে-ভাবে বর্ণনা করলেন তাতে আপনার চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য।'

'কেন ?'—লালমোহনবাবুর ভুরু দুটো নাকের উপর জুড়ে গিয়ে সেকেন্ড ব্র্যাকেট হয়ে গেল।

ফেলুদা বোর্ড ভাঁজ করে ঘুঁটিগুলো বাক্সে ভরতে ভরতে বলল, 'কারণ কোনও ঘটনা বা